কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন কলিকাতা-৯

হর্ষবর্ধন গোবরধনের কেরামতি

ঃঃ এতে যা আছে ঃঃ

হর্ষবর্ধন ও গোবরধনের কেরামতি

আসাম সরকারের নোটিস এসেছে প্রত্যেক আসামীর কাছেই। হর্ষবর্ধনরাও বাদ যাননি, যদিও বহুকাল আগে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে কাঠের ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন, তাহলেও আসাম সরকারের কঠোর দৃষ্টি এড়াতে পারেননি।

শুধু তাঁর ওপরেই না, তাঁর ভাই গোবর্ধনও পেয়েছে এক নোটিস সীমান্ত যুদ্ধে যাবার নোটিস।

পররাজ্য লিপ্সায় চীন যখন নেকার সীমানা পার হয়ে তেজপুরের দরজায় এসে হানা দিল, তখন কেবল আসামবাসীদেরই নয়, প্রত্যেক তেজস্বী ভারতীয়েরই ডাক পড়েছিল চীনকে রুখবার আর তেজপুরকে রাখবার জন্যে।

কলকাতায় হর্ষবর্ধনের কাছেও এসে পৌঁছালো সেই ডাক। হর্ষবর্ধন কিন্তু বললেন—'না আমি যুদ্ধে যাবো না।'

'সে কী, দাদা!' বিস্ময়ে হতবাক গোবর্ধন, 'তুমি না বিলেতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলে। সেই যুদ্ধ যখন নিজের দেশেই এসেছে এই সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে?'

'বিলেত গেছিলাম আমি? সে তো ইসপেন!' বলেন হর্ষবর্ধন। ইসপেনেই তো লড়েছিলাম।'

'একই কথা। বিলেত যাবার পথেই ইসপেন। সেখানে হিটলারের ফ্যাসিস্ত বাহিনীকে তুমি ফাঁসিয়ে দিয়ে এসেছো। আমিও তো লড়েছিলাম তোমার পাশেই। আমাদের লড়াইয়ে সেই কাহিনী 'যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন বইতে ফাঁস করে দিয়েছে সেই হতভাগাটা।'

'কোন্ হতভাগা?'

তাকে ?'

'জানবো না কেন ? পড়েছি তো বইটা। আমাকেও দিয়েছিল একটা। লোকটা ভারী বাড়িয়ে লেখে কিন্তু। গাঁজা খায় বোধ হয়।'

'হ্যাঁ বড্ডো গাঁজায়, ওর সব গুলই গাঁজানো।'

'গঞ্জনাও বলতে পারিস— সমস্কৃত করে। কিন্তু সে কথা নয়, কথা হচ্ছে এই চিরকাল আমরাই যুদ্ধে যাবো নাকি ? তখন যুবক ছিলাম লড়েছি, কিন্তু বুড়ো হয়ে যাইনি কি এখন, গায়ের জোর কমে যায়নি ? বন্দুক তুলতে গেলেই তো উল্‌টে পড়বো মনে হয়। তাছাড়া প্যারেড। লম্বা লম্বা রুট মার্চ করতে পারব এই বয়সে ?'

'এই মার্চ মাসে তো নয়—এমন গরমে।' গোবর্ধন সায় দেয়।

'তবে ? এখন যারা যুবক তারা গিয়ে যুদ্ধ করুক। আমরা তো লড়ায়ের কথা পড়ব খবরের কাগজে। কিংবা বলব সেই চকর্‌বর্‌তিকে তাদের যুদ্ধের গল্প লিখতে···বইয়ে পড়া যাবে।'

'তা বটে!'

'আর তারাই তো লড়ছে এখন। সেই জাওয়ানেরাই।'

'জাওয়ান! জাওয়ান আবার কি দাদা ?'

'রাষ্ট্রভাষা! জাওয়ান মানে জোয়ান।

'মানে তুমি।' জানায় গোবর্ধন।

'আমি জোয়ান! তার মানে!' হর্ষবর্ধন হক্‌চকান।

'বৌদি বলল যে সেদিন!' প্রকাশ করে গোবরা।

'তোর বৌদি বলল আমি জোয়ান ? সে-ই দেখছি ফাঁসাবে আমায়। কোনো মিলিটারি অফিসারের কাছেই বলেছে নাকি সে।'

'শুনি তো ব্যাপারটা। সে যদি আবার গল্প লিখে কথাটা ছাপিয়ে দেয় তাহলেই তো গেছি! তারপর এই নোটিশ এসেছে!'

'বৌদির ইতুপূজোর ব্রত ছিল না ? পূজো-টুজো সেরে বলল আমায়, যাও তো ভাই একটা বামুন ধরে নিয়ে এসো তো! বামুন

ভোজন করাতে হবে। আমি বললাম, বৌদি, ইতুপুজো করবে যখন তখন বামুন-ভোজন করাতে ইতুর দাদাকেই ধরে নিয়ে আসি না হয়!

ইতুর দাদাকে? শুনে বৌদি তো অবাক! আমি খোদ ইতুকেই ধরে আনতে পারতাম। জ্যান্ত ইতুর পুজো করতে পারতে। তা যখন হলো না, তাহলে তার দাদাকেই ধরে আনা যাক এখন। তখন বৌদি বুঝতে পারলো কথাটা।'

'সবকিছুই একটু লেটে বোঝে সে।' হাসলেন হর্ষবর্ধন।

'গেলাম চকর্‌বর্‌তির কাছে। খাবার কথা শুনে তখনি সে পা বাড়িয়ে তৈরি। কিন্তু যখন শুনলো যে ব্রত উদ্‌যাপনের বামুন-ভোজন, তখন আবার পিছিয়ে গেল ঘাবড়ে। বলল, ভাই, আমি তো ঠিক বামুন নই। পৈতেই নেইকো আমার। আমি বললাম ধোপার বাড়ি কাচতে দিয়েছেন বুঝি? সে বলল, তা নয়, ঠিক কখনো পৈতে হয়েছিল কিনা মনেই পড়ে না আমার। তা না হোক আপনার দাদার পৈতে ছিলো তো? আমি বলি। বামুন না হোক, বামুনের ছেলে হলেই হবে। তখন সে এলো খেতে।'

'সর্বনেশে কথাই বটে। লোকটার কথাই এই রকম। পেট ঠেসে খেয়ে ঢেকুর তুলে বলে কিনা সে—সবই তো করলেন বৌদি, বেশ ভালোই করেছেন। রেঁধেছেন খাসা। কেবল একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। অম্বলটা করেননি, একটু অম্বলও করতে পারতেন এই সঙ্গে। শুনে বৌদি বলল, চকর্‌বর্‌তি মশাই, এ বাজারে কি খাঁটি জিনিস মেলে? এখন কাঁকরমণি চালের ভাত, পচা মাছ, বাদাম তেলের রান্না, এই থেকেই যথেষ্ট অম্বল হবে, সেই ভেবেই আর অম্বলটা করিনি, শুনে তো আঁতকে উঠল লোকটা—অ্যাঁ। বলেন কি! তাহলে তো হজম করা মুশকিল হবে দেখছি? হজম করাবার কোন দাবাই আছে বাড়িতে? দিন তাহলে একটু! এর সঙ্গে খেয়ে নিই। কি রকম দাবাই? জানতে চাইলেন বৌদি—এই জোয়ান টোয়ান?'

'এ বাড়িতে জোয়ান বলতে তো···'জানালো বৌদি—জোয়ান বলতে গোবরার দাদা। তা তিনি তো এখন ঘুমুচ্ছেন।

'তোর বৌদির যেমন কথা। আমি যদি জোয়ান, তাহলে প্রৌ··· প্রৌ···প্রৌ—কথাটা কিরে। গলায় আসছে মুখে আসছে না! মানে প্রৌড় কে তাহলে?

'প্রৌড়?'

'প্রৌড়, নাকি প্রৌঢ়? ও সে একই কথা। তোর বৌদির সার্টিফিকেটে দেখছি আমায় তেজপুর গিয়ে গড়াতে হবে। বিধবা হতে হবে আমায় এই বয়সে।'

'তুমি বিধবা হবে? বলো কি?' গোবরা হাঁ করে থাকে।

'আমি কেন—তোর বৌদিই হবে তো, সেই তো হবে বিধবা। ও সে একই কথা। তা মজাটা টের পাবে তখন। মাছ খেতে পাবে না, তার সাধের বেড়াল মাছ না পেয়ে পালিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। বোঝো ঠ্যালা।

বৌদির ঠ্যালা বৌদি বুঝবে। এখন নিজেদের ঠ্যালা তো সামলাই আমরা! বলে গোবরা।

'সামলানোর কী আছে আর। জবাব দেন দাদা, 'বললাম না এই ঠ্যালায় গড়াতে হবে গিয়ে তেজপুরে। মুণ্ডু একদিকে গড়াবে, ধড়টা আর একদিকে।'

'আমিও গড়াবো তোমার পাশেই দাদা।' গোববার উৎসাহ আর ধরে না।

'হায় হায়! বংশ লোপ হয়ে গেলো আমাদের।' কাতর স্বরে শুরু করেন শ্রীহর্ষ, একলক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি, একজনও না রহিল বংশে দিতে বাতি।' রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে গুলিয়ে রাবণের শোকে তিনি মূহ্যমান থাকেন।

'মিছে হায় হায় করছো দাদা। তোমার ছেলেও নেই, নাতিও নেই'—গোবর্ধন বাতলায়, তোমার বংশ লোপ হবে কি করে?

'নাতিবৃহৎ তুই তো আছিস! তুই গেলেই আমাদের বংশ গেলো।' দাদার শোক উথলে ওঠে, এতোদিনে আমাদের রাবণ বংশ গোল্লায় গেলো। আর বর্ধিত হতে পেল না গোলায় বল্ আর গোল্লায় বল,··· একই কথা।'

'না, না! তোমাকে কি ওরা ফ্র ··ফ্র···ফ্র···ফ্র···'

'কী ফড়ফড় করছিস—'

'ফ্রন···। বলেই হতবাক গোবর্ধন।

'মানে ?' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

'মানে, তোমাকে কি ওরা আর ফ্রণ্টে পাঠাবে?' কথাটা খুঁজে পেয়েছে গোবরা, 'তুমি নাকি ইসপেনের যুদ্ধ জয় করে এসেছো! পড়েছে নিশ্চয়ই তারা বইয়ে। তাইতো ডেকেছে তোমাকে। অবিশ্যি তোমাকে তারা সেনাপতিটাও করে দেবে। সামনে থেকে লড়তে হবে না তোমাকে। মরতে হবে না গোলায়। পেছন থেকে পালাবার পথ পরিষ্কার পাবে।'

'পেয়েছি! পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে। যুদ্ধ কাকে বলে জানিস নে তো!' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন দাদা, 'সে বড়ো কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

'দাদা-ভাইয়ে দেখা হবে কিন্তু।' গোবর্ধন আশ্বাস দেয়, 'তোমার ধারে কাছেই থাকব আমি। পালাবো না।'

'জ্বালাসনে আর। এখন পড়তো কি লিখেছে নোটিসটায়।'

'গোখেল রোডের একটা ঠিকানা দিয়েছে।' নোটিস পড়ে গোবর্ধন জানায়, 'রিক্রুটিং অফিসের ঠিকানা। সেখানে আগামী পরশু সকাল দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। নাম লেখাতে হবে। তারপরে মেডিক্যাল একজামিনেশনের পর ভর্তি করে নেবার কথা।'

'আর যদি না যাই?'

'ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে পাকড়ে নিয়ে যাবে পেয়াদায়।'

'আর যদি পালিয়ে যাই এখান থেকে?'

'ছলিয়া বেরিয়ে যাবে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে বোধ হয়।'

পুলিস! ওরে বাবা!' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন, 'তাহলে আর না গিয়ে কাজ নেই। যাবো আমরা।'

যথা দিবসে যথাস্থানে গেলেন দু'ভাই। দাঁড়ালেন পাশাপাশি। প্রথমে পরীক্ষা হলো হর্ষবর্ধনের।

'নাম?'

'শ্রীহর্ষবর্ধন।'

'বয়স?'

'বিয়াল্লিশ।'

পিতার নাম?'

'পৌণ্ড্রবর্ধন। মা'র নাম বলব?'

'না। দরকার নেই। ঠিকানা?

'চেতলা।'

'পেশা?'

'কাঠের কারবার।'

'ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া একটা কাজের বস্তু, গৌরবের বস্তু বলে কি আপনি মনে করেন?'

নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'বাহিনীর কোন বিভাগে ভর্তি হতে চান আপনি?'

'আজ্ঞে?' প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেন না হর্ষবর্ধন।

'নানান বিভাগ আছে তো? পদাতিক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী—'

'আমি একেবারে জেনারেল হতে চাই। মানে সেনাপতিটতি।' জানান হর্ষবর্ধন।

'পাগল হয়েছেন!' রিক্রুটিং অফিসার কথাটা না বলে পারেন না।

সেটা একটা শর্ত নাকি?' হর্ষবর্ধন জানতে চান, 'জেনারেল হতে হলে কি পাগল হতে হবে?'

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে অফিসার গোবর্ধনকে নিয়ে পড়েন।—'নাম?'

গোবর্ধন।'

'বয়স?'

'বত্রিশ। আর বাকি সব ঐ ঐ ঐ ঐ মানে—ঠিকানা, পিতার নাম, পেশা সব—ঐ ঐ।' বিশদ করে দেয় গোবরা অর্থাৎ ইংরেজি করে বললে—ডিটো ডিটো, আমরা দুই ভাই কিনা।'

'ও! তাহলে আপনারা এবার ঐ পাশের ঘরে চলে যান, সেখানে আপনাদের মেডিক্যাল চেক্-আপ হবে।' বললেন অফিসার, 'ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করতে পারলে তবে ভর্তি।

'পাশের ঘরে যাবার পথে ফিস্-ফিস্ করে গোবরা, 'আর ভয় নেই, দাদা! আমার জীবনে কোনো পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি, আর ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করবো? ফেল যাবো নির্ঘাত! বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

হ্যাঁ, ফেলেছে কিনা আমাদের।' আশ্বাস পান না দাদা, 'এই যুদ্ধের বাজারে কেউ ফেলবার নয়, কিছু ফ্যালনা না।'

হর্ষবর্ধনের বিপুল ভুঁড়ি দেখেই বাতিল করে দিলেন ডাক্তার—'না, এ চলবে না।' প্রতিবাদ করে বলতে গেছলেন বহুৎ বহুৎ জেনারেলের ভুরি ভুরি ভুঁড়ি তিনি দেখেছেন—যদিও ফটোতেই তাঁর দেখা। কিন্তু তাঁর ভুঁড়িতে গোটা দুই টোকা মেরে তুড়ি দিয়ে তাঁর কথা উড়িয়ে দিলেন ডাক্তার।

তারপর গোবর্ধনের পালা এলো। সব পরীক্ষায় পাস করার পর চক্ষু পরীক্ষা।

'চার্টের হরফগুলো পড়তে পারছেন তো? দেয়ালের গায়ে যে চার্ট ঝুলছে?'

'অ্যাঁ! ওখানে একটা দেয়াল আছে নাকি আবার।'

আপনার চোখ তো দেখছি তেমন সুবিধের নয়।' বলে ডাক্তার

একটা অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড ট্রে ওর চোখের ছ-ফুট দূরে ধরে রেখে শুধোলেন, 'এটা কী দেখছেন বলুন তো ?'

'একটা আধুলি বোধ হয়, নাকি, সিকিই হবে !'

দৃষ্টিহীনতার দোষে গোবর্ধনও বাতিল হয়ে গেলো।

গোখেল-রোডের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল দু'ভাই : 'চল দাদা ! আজ একটু ফুর্তি করা যাক। আড়াইটে বাজে প্রায়। রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে দুজনে মিলে তিনটের শোয়ে কোনো সিনেমা দেখিগে !

নানান খানা খেতে খেতে তিনটে পেরিয়ে গেল, তিনটের পরে সিনেমার অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকল দু'ভাই। নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল পাশাপাশি।

ইন্ট্যারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতেই চমকে উঠলেন হর্ষবর্ধন। পাশেই যে সেই ডাক্তারটা বসে ! খারাপ চোখ নিয়ে সিনেমা দেখছে দিব্যি। এতো কাণ্ড করে শেষটায় বুঝি ধরা পড়ে গোবরা।

কনুয়ের গুঁতোয় পাশের ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলেন দাদা।

গোবরা কিন্তু ঘাবড়ালো না, জিজ্ঞেস করল সেই ডাক্তারকেই, 'কিছু মনে করবেন না, দিদি ! শুধোচ্ছি আপনাকে—এটা তিরিশ নম্বর বাস তো ?'

'অ্যাঁ ! অতর্কিত প্রশ্নবাণে চমকে ওঠেন ডাক্তারবাবু।

'মানে, মাপ করবেন বড়দি ! এটা চেতলার বাস তো ? ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তো পড়লাম কিন্তু বাসে উঠেছি কিনা বুঝতে পারছি না। চেতলা পৌঁছাবে কি না কে জানে।'

———

● ● ● ● ● ● ●

হর্ষবর্ধনের বিড়ম্বনা

বাড়ি ফিরেই হর্ষবর্ধন গোবরাকে ডেকে বললেন : 'এইমাত্র একটা স্কাউ বয়েটের সঙ্গে ভাব হলো।'

'স্কাউ বয়েট! সে আবার কি?'

স্কাউ বয়েট! তাও জানিসনে? এই যারা পরের উপকার করে বেড়ায়' তারাই হলো স্কাউ বয়েট।'

'স্কাউ বয়েট! ভারি অদ্ভুত নাম ত! গোবর্ধন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে : কথাটার মানে কি দাদা?'

'মানে? মানে আর এমন শক্ত কি? ইংরেজী কথার যা মানে হয় তাই! স্কাউ মানে হলোগে গরু, আর বয়েট! বয়েট মানে—

গোবর্ধন এবার নিজের মধ্যে খোঁজাখুঁজি লাগায় : 'বয়েট মানে বয়াটে নয় ত?'

'বয়াটে? বয়াটে গোরু? তার মানে?' হর্ষবর্ধন বেশ একটু অবাক হন : গোরু আবার বয়াটে কি?

'অর্থাৎ যে-সব গোরু একেবারে বয়ে গেছে। গোবর্ধন বাতলে দেয় : 'বারোটা বেজে গেছে যাদের।'

'তা ত বুঝলাম। হর্ষবর্ধন বলেন : 'কিন্তু গোরু কেন হতে যাবে ছোট্ট একটা ছেলে। একসঙ্গে এক ট্রামে এলাম এতক্ষণ। দিব্যি খাকি রঙের হাফ প্যাণ্ট, খাসা পোশাক পরে গলায় রুমাল জড়িয়ে পরের উপকার করতে বেরিয়েছে। কিন্তু ছেলেটা যে স্কাউ বয়েট তা আমি টের পাইনি। কি করে পাব, একটা ছেলে পাশে বসে চলেছে এই জানি, জানলাম ঢের পরে, যখন মরতে মরতে বেঁচে গেছি তখন। আরেকটু হলেই ট্রামে কাটা পড়ে গেছিলাম আর কি! সেই স্কাউ

বংটাই তো বাঁচিয়ে দিলে! মানুষের উপকার করা ওদের নিয়ম কিনা!'

'বাঃ, বাঃ! সত্যি, ভারি উপকারী ত ছেলেটা! আর সব ছেলের মত নয় ত?'

'যা বলেছিস! আমি তাই ঠিক করেছি, আমিও একটা স্কাউট বয়েট হব। যাকে পাব, যাদের পাকড়াতে পারব, তাদের উপকার, করে দেব। দেবই। তুই কি বলিস?'

'স্কাউ বয়েটের পোশাক ত চাই। পোশাক কই তোমার?'

'নাঃ, সে পোশাক আমার পোশাবে না। মার্কামারা স্কাউ বয়েট নাই-বা হলাম, এমনিই লোকের উপকার করা যায় না? ধরে-বেঁধে করা যায় না কি? করলে কী ক্ষতি?

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্ধনের টনক নড়ল, আগের দিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

'হ্যাঁ, আজই! আজই তো! আজ থেকেই আমি পরের উপকারে লাগব। বেকার জীবন কোন কাজের না। যো পেলেই কারু না কারু, কিছু না কিছু, একটা না একটা উপকার আমি করবই! করতেই হবে, নইলে জীবন ধারণই বৃথা।'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের খেয়াল হলো, আচ্ছা, বাড়ি থেকে আরম্ভ করলে কেমন হয়? গোবর্ধন থেকেই শুরু করলে মন্দ কি? নিজের ভাইকেই প্রথমে পর বিবেচনা করে, পরোপকারের হাতেখড়ি হোক না কেন?

তারপর? তারপর পরের ভাইরা ত পড়েই আছে। খুশিমতো করলেই হলো।

হর্ষবর্ধন হাতের পাঁচ ধরেই আগে টান মারেন: 'গোবরা। গোবরা রে! এই গোবরা। গেল কোথায় হতভাগা?'

আশ্চর্য! তিনি উপকার করবেন, হাত ধুয়ে বসে আছেন, অথচ যার উপকার হবে তারই কিনা পাত্তা নেই। দেখো দিকি কাণ্ড!

হাঁক-ডাক পড়তেই গোবরা এসে হাজির—'এই সকালে এত ডাক পাড়াপাড়ি কিসের শুনি ?

'আমি ভাবছি তোর একটা উপকার করলে কেমন হয় ? অ্যাঁ ?' দাদার গুরু-গম্ভীর মুখ থেকে বেরোয়।

'আমার ? আমার আবার কী উপকার করবে ?' গোবরা আকাশ থেকে পড়ে : 'আমার কেন।' এবং খুব ভীত হয়।

'করতে হয়। তুই বুঝিস নে। যা, এখন একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে আয় আগে। নিয়ে আয় বলছি।'

'চ্যালা কাঠ কি হবে ? আরো অবাক হয় গোবরা।

'আনলেই টের পাবি।' দুর্বহ দায়িত্বের মোট মাথায় করে হর্ষবর্ধনের সারা মুখ তখন গুমোট : 'হাতে-নাতেই দেখিয়ে দেবো।'

চ্যালা কাঠটা হাতিয়ে নিয়ে দাদা বলেন : 'আচ্ছা, তোকে যদি আজ থেকে কেবল পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াই, সেটা কি খুব উপকার হবে না ?'

'আমাকে ? পিঠে করে ? কেন পিঠে কেন ?'

'বাঃ, চলতে-ফিরতে তোকে তাহলে বেগ পেতে হয় না। হাঁটা-চলায় কত না কষ্ট তোর। তার বদলে কেউ যদি তোকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায় মন্দ কি ?'

গোবর্ধন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে : 'বলতে পারি না। তা হয়ত একরকম মজাই হবে।

তাই ভাবছি, আজ থেকে তোকে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াব। দিন-রাত তুই আমার পিঠে-পিঠেই থাকবি। বড়-বড় দেবতার যেমন পীঠস্থান থাকে, তেমনি আমার পিঠ-স্থানে তোকে প্রতিষ্ঠা করব। কেমন ?'

এতখানি দেবত্বের প্রলোভনও গোবর্ধনকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, সে আপত্তির সুর তোলে : 'কিন্তু সেটা কি খুব ভাল হবে ?'

'কেন হবে না ? তোর উপকার হবে, তোর ভাল করা হবে,

অথচ ভাল হবে না, সে কেমন কথা ?

একটু-আধটু মাঝে-সাঝে চাপতে পেলে মন্দ হয় না—কিন্তু দিন-রাত—তথাপি গোবর্ধনের কিন্তু কিন্তু যায় না।

'তাহলে আর কি ? তাহলে আগে তোকে খোঁড়া হতে হয়, এই যা। পা-ওয়ালা কাউকে ত পিঠে বয়ে বেড়ান ভাল দেখায় না। মানায়ও না তেমন। সেটা আর কি এমন উপকার করা হলো ? 'খোঁড়া মানুষকে যে পিঠে তুলে নেয় সেই তো যথার্থ দয়ার্দ্র—সত্যিকারের উপকারী সেই ত।'

'সে-কথা ঠিক দাদা। গোবর্ধন সায় দেয়। আমার চেয়ে বরং কোন একটা খোঁড়াকে—'

'আরে, তাইত কাঠটা আনিয়েছি। আগে তোর পা ভাঙি, খোঁড়া করি, তারপর—তারপর ত—' এই বলে যেই না হর্ষবধ ন চ্যালাকাঠসহ গোবর্ধনের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করেছেন, গোবর্ধন কি করে বলা যায় না এক মুহূর্তেই সমস্ত রহস্যটা যেন সহজে বুঝে নেয়, অপদস্থ হবার অনির্বচনীয় একটা আশঙ্কা তার ভেতরে সংক্রামিত হয়ে অকস্মাৎ তাকে ভয়ানক বিচলিত করে তোলে। তিন লাফে সিঁড়ি টপকে ছাদে উঠে চিলে-কোঠায় ঢুকে সে খিল এঁটে দেয়।

'ধুত্তোর। বাড়ির কারুর কোন উপকার আমার দ্বারা হবার নয়। দেখি, বাইরের কারোর সুবিধেমত কিছু করা যায় কিনা।' এই বলে চ্যালাকাঠকে সুদূরপরাহত করে হর্ষবর্ধন বেরিয়ে পড়লেন। গলায় একটা রুমাল জড়িয়ে নিতে ভোলেননি। পুরোপুরি বয়স্কাউট না হতে পারুন, কেননা হাফ প্যান্ট পরা তাঁর পক্ষে যতটা অসম্ভব, Boy হতে পারা এতখানি বয়সে তার চেয়ে কিছু কম অসাধ্য নয়, তাই যতটা রয়-সয়, ততটাই কেবল করেছেন। রুমাল বেঁধেছেন গলায় বিশ্বব্যাপি পরোপকারের বাসনা গলায় নিয়ে তিনি যে বেরিয়েছেন, সেইটে জানানোর জন্যেই ওটা জড়ান।

বড় রাস্তার মোড়ে যখন হর্ষবর্ধন পৌছলেন তখন তাঁর অন্তর্গত

বিশ্বপ্রেমের নানা বেশ ভাল করেই জমাট বেঁধে গেছে, বিশ্বের হিত-লালসায় তখন তিনি লালায়িত। কারো-না-কারো, কিছু-না-কিছু ভাল করেই করবেন, সুযোগ পেলেই করে দেবেন এবং করেই সরে পড়বেন। কেউ টের পাবে না, জানতে পারবে না, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক বাজিয়ে তা জাহির করা হবে না। নামের জন্যে নয়, লাভের জন্য নয়, নিঃস্বার্থভাবে পরের আর নিঃস্বের উপকার—খুব বেশি না হোক, একটুও একজনেরো অন্তত। একটাই যথেষ্ট আজ।

হ্যাঁ, একটাই বা কম কি? আজ একটা ভাল কাজ, কাল হয়ত আরেকটা। পরশু আবার আরেকটা। এইভাবে বারবার এমনি করতে করতেই ভাল কাজ করার অভ্যাস হয়ে যাবে, বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে শেষটায়। এই করে করেই ত মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

ভাবতে ভাবতে হর্ষবর্ধন একটা ফাঁকা ট্রাম দেখে উঠে পড়েন। গালিফ স্ট্রীটের গাড়ি ধর্মতলা ঘুরে যাবে। এসপ্ল্যানেড পৌঁছতেই প্যাসেঞ্জার ভরে ওঠে। হর্ষবর্ধন ভাবনায় ভাবিত হতে থাকেন।

কত কি ভাবনা! বাস্তবিক, পরের উপকার করা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার! কখন কোথায়, কার উপকার করবেন? কি কি করেই বা করবেন? ফাঁক কই করবার?

হঠাৎ তিনি চোখ তুলে দেখেন তাঁর সামনের সীটে হাতখানেকের মধ্যেই, একটি বয়স্ক মেয়ে কখন এসে বসেছে। তার কোলে ছোট্ট একটি শিশু। মেয়েটির রোগা লম্বা মুখ; পরিচ্ছন্ন হলেও কাপড়-চোপড়ে পরিষ্কার দারিদ্র্যের ছাপ। জীবন-সংগ্রামে ও যে নাজেহাল হয়ে পড়েছে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

দেখবামাত্রই হর্ষবর্ধনের হৃদয় বিগলিত হতে থাকে। এই ত তাঁর সুযোগ। সুযোগই বলতে গেলে। মেয়েটির কব্জি থেকে ময়লা একটা হাতব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগের মুখ খোলা—হর্ষবর্ধন তা

লক্ষ্য করেন।

ব্যাগের ঐ অর্ধোদয়যোগে একটা আধুলি কিংবা একটা টাকাই হোক, অনায়াসে অজ্ঞাতসারে তিনি ফেলে দিতে পারেন। বাড়ি ফিরে মেয়েটি কি আহ্লাদিতই না হবে তাহলে। অপ্রত্যাশিত অর্থের মুখ দেখে কী আনন্দই না হবে ওর। না, টাকা নয়, পাঁচ টাকার একটা নোট তিনি গলিয়ে দেবেন। অচেনা উপকারের কথা ভেবে কী উদ্ভাসিতই না হয়ে উঠবে মেয়েটি! নিজে ভেবে নিজের মনেই পুলকিত হতে থাকেন হর্ষবর্ধন।

পাঁচ টাকার একটা নোট করতলগত করে আস্তে-আস্তে তিনি সামনের দিকে ঝোঁকেন। উপকার করবার দুঃসাহসে তাঁর বুক দুরদুর করতে থাকে। তাক বুঝে ফাঁক গলিয়ে ফেলতে যাবেন এমন সময়ে একটা কান-ফাটানো গলা খন-খন করে উঠল, 'লোকটা আপনাব পকেট মারছে।'

পাশের আসনের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাঁর দিকে আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

মেয়েটি আর্তনাদ করে ব্যাগ সামলে নেয়। কোলের ছেলেটা ককিয়ে ওঠে। কণ্ডাক্টর টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। বিপদসূচক ঘণ্টা। ট্রামের প্রত্যেকে হর্ষবর্ধনের দিকে তাকায়। হর্ষবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে হাত টেনে নেন এবং নিজের পকেটে পুরে দেন। বোকার মতো কাজ করেন অবশেষে।

সারা গাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে যায়। সবাই কথা বলতে থাকে। কেবল একজন অতি বলিষ্ঠ লোক বিনা বাক্যব্যয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে হর্ষবর্ধনের হাত চেপে ধরে। তারপর শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে: দেখুন তো, আপনার ব্যাগ থেকে কিছু সরাতে পেরেছে কিনা।'

ট্রাম থেমে যায়। হর্ষবর্ধন আমতা আমতা করেন: 'আমি বলছি —বলছি—আমি সে রকম কিছু না—'

কিন্তু কি করে তিনি খোলসা করবেন যে, ঠিক উলটোটাই তিনি

করতে যাচ্ছিলেন! গাড়ির একজনও কি তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে? তাঁর নোট গলানোর কথায়?

নাঃ, কিছু নিতে পারেনি!' মেয়েটি গজগজ করেঃ 'বেচারার পোড়া বরাত। চারটে সিকি আর দুটো পয়সা ছিল মোট। তাই রয়েছে। কিছু নিতে পারেনি।'

'আপনি কি ওকে পুলিসে দিতে চান?' কণ্ডাক্টার শুধোয়।

'চুরি তো করতে পারেনি তবে আর পুলিসে দিয়ে কি হবে।'

'চুরি! চুরি না!' হর্ষবর্ধনের অর্ধস্ফুট গলা থেকে বেরোয়ঃ 'আমি —আমি—আমি—'

ধিক্ ধিক্! মেয়েছেলের পকেট মারতে গেছ! গলায় দড়ি দাওগে! কেন আমাদের কি পকেট ছিল না? না, পকেটে কিছু ছিল না আমাদের? দাও ওকে ট্রাম থেকে ফেলে! দূর করে দাও।' ইত্যাদি নানান কণ্ঠ থেকে নানাবিধ বক্তব্য প্রকাশ হতে থাকল।

কণ্ডাক্টরের সময় বয়ে যাচ্ছিল। ধৈর্যও যায় যায়। তাই সে হর্ষবর্ধনকে তাড়া লাগায়ঃ 'এই নেমে যাও গাড়ি থেকে।'

এর উপরে আপীল চলে না। ট্রাম থেকে হর্ষবর্ধন নেমে গেলেন আস্তে আস্তে।

প্রথম পরহিত চেষ্টার এই বিপরীত ফল দেখে তাঁর মেজাজ তখন খিঁচড়ে গেছে। তিনি বেশ ঘা খেয়েছেন এবং দলে, দুমড়ে, হতাশ হয়ে গেছেন। উৎসাহের অনেকখানিই তাঁর টুপে গেছে তখন। কিন্তু ভেবে দেখলে পরহিত-কারীদের পথ চিরদিনই কি এমনি অপ্রশস্ত—এ-হেন ক্ষুরধার নয়? এই রকম কন্টকাকীর্ণ-ই নয় কি? পৃথিবীর যে-সব মহৎ লোক অকালে মহাপ্রয়াণ করেছেন, যীশুখ্রীষ্ট থেকে শুরু করে যে-সব মহাত্মা পরের ভাল করতে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছেন! তাঁদের এবং হর্ষবর্ধনের ইতিহাস কি প্রায় এক নয়? আস্তে আস্তে আবার তাঁর প্রেরণা আসতে থাকে।

এইভাবে ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা ষ্টেশন পায়ে

পায়ে পার হয়ে যান, চলতে চলতে শহর ছাড়িয়ে ক্রমে গাঁয়ের পথে গিয়ে পড়েন হর্ষবর্ধন। বেশ কিছুটা উত্তরে এসেছেন সন্দেহ নেই, কয়েক মাইলই হয়ত হবে, আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁর মত একটা জায়গায় এসে পড়েছেন। হ্যাঁ, এই পাড়াগাঁই তিনি চান, গেঁয়ো লোকের সঙ্গই তাঁর কাম্য। শহরের লোকদের মত সন্দিগ্ধ নয়—তারাই মানুষ। কোঁচা দুরস্ত শহুরেদের মতো ওরা নয়—ওরাই ওঁর বাঞ্ছনীয়।

এবং এই গ্রামের মধ্যে কেউ না কেউ অভাবাপন্ন থাকতে পারে, উপকৃত হবার যার উপস্থিত প্রয়োজন, হর্ষবর্ধনের সাহায্যপ্রাপ্ত হতে যে বিন্দুমাত্র বাধা দেবে না। উপকৃত হয়ে যে বাধিত হবে, ধন্যবাদ জানাবে, চিরকৃতজ্ঞ থেকে যাবে—চিরদিন হর্ষবর্ধনকে বদান্য বলে সন্দেহ করবে, শহুরে লোকদের মত তাঁকে বদ বা অন্য কিছু ঠাওরাবে না।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি চালাতেই দেখতে পান, একটি চাষার মেয়ে তরকারির মোট মাথায়—বোঝার ভারে কাতর ও কুঁজো হয়ে পথে চলেছে। তক্ষুনি তাঁর পুরোনো সঙ্কল্প ফিরে আসে। পরের গুরুভার বহন করে হাল্‌কা করে দেবার বাসনা তাঁর বক্ষে চাগাড় দেয়।

হর্ষবর্ধন মেয়েটির কাছে এগিয়ে যান। স্বাভাবিক হেঁড়ে গলাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে মিঠে করে আনেন: 'দাও, ওই বোঝা আমায় দাও, আমি তোমার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসছি।'

মেয়েটি সন্দিগ্ধ নেত্রে ওঁর দিকে তাকায় ও বলে, 'তুমিই বুঝি? তুমিই বুঝি সেই লোক!'

'আমি, কি!' হর্ষবর্ধন ঘাবড়ে যান। 'কী বলছো!'

'পচার মার কাঁখ থেকে গুড়ের নাগরি নিয়ে পগার-পার করেছিলে তুমিই তো! সাতদিনও হয়নি যে গো। এর মধ্যেই ভুলে গেছ!'

'আমি, আমি কেন পালাব?' হর্ষবর্ধনের ধোঁকা লাগে।

'বাঃ, বাড়ি বয়ে দিয়ে আসছি এই বলে—যেমন আমার গায়ে পড়ে এসেছ গো! পচার-মার কান্নায় সাত-রাত্রির পাড়ার কারুর ঘুম

হয়নি আমাদের, আর বলা হচ্ছে—আমি কেন পালাব? মরে যাই আর কি?'

'আমি নই? আমার মত অন্য কেউ হতে পারে।' হর্ষবর্ধন আমতা আমতা করেন: 'গুড়ের নাগরি আমি কখনো চোখেও দেখিনি।'

'আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে! ড্যাকরা কোথাকার, ডাকব নাকি সবাইকে, ডেকে জড়ো করব লোক? পচার-মা বলছিল মানুষটার গোঁফ ছিল না, এখন দেখছি দিব্যি গোঁফ! শখ করে রাতারাতি গোঁফ লাগান হয়েছে। পরকে ঠকাবার ফন্দি! ঠগ কোথাকার! দেখি তো, গোঁফটা ঝুটো কি সাচ্চা—টেনে ছিঁড়ে নিয়ে দিইগে পচার-মাকে।'

এই বলে সেই চাষার মেয়ে স্বহস্তে মাথার মোট অবললাক্রমে মাটিতে নামিয়ে রেখে, তার চেয়েও আরো বেশী অবলীলাক্রমে, হর্ষবর্ধনের গোঁফের দিকে অগ্রসর হয়।

হর্ষবর্ধন আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালেন না। কোথায় পরের গুরুভার বহন করবেন, না সেখানে নিজেরই গুরুভার লাঘব হবার যোগাড়। উল্টো আর বলে কাকে!

সর্বনাশ আসন্ন হলে পণ্ডিতেরা যেমন সম্পত্তির অর্ধেক ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না—হর্ষবর্ধনও তেমনি এহেন গোলযোগে কর্তব্যের গুরুভার পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজের গুরুভার বহন করেই সরে পড়েন।

নাঃ, আর পরোপকার না। পরোপকারের আশা দুরাশা মাত্র। সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হলো! মনে মনে এই সব পর্যালোচনা করতে করতে, উর্ধ্বশ্বাসে হর্ষবর্ধন একেবারে আধ মাইল দূরে গিয়ে তবে হাঁফ ছাড়েন।

নাঃ, প্রাণান্ত করলেন, নানাভাবেই চেষ্টা করে দেখলেন, আর কিভাবে পরের উপকার তিনি করতে পারেন? অবশ্য ডুবন্ত লোককে সলিল সমাধি থেকে বাঁচানো যায়, তবে কিনা, এখন হাতের কাছে

তেমন ডুবুডুবু লোক কই, পাচ্ছেন বা কোথায়, আর যদিই পান—হাত ধরা কাউকে পেয়েই যান—তাহলেই বা কী! সাঁতারের স-ও তো তাঁর জানা নেই। উঁচু মই বেয়ে উঠে প্রজ্জ্বলন্ত পাঁচতলা বাড়ির ধূমায়মান কুঠুরির ভেতর সেঁধিয়ে—লেলিহান অগ্নিশিখাদের ভেদ করে ছোট্ট একটা কচি মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা, পরোপকার হিসেবেই বা এমন মন্দ কি? পরোপকারের বাড়াবাড়িই বলা যায় বরং। মই-টই পায়ের কাছে রেখে, আড়ালে-আবডাল থেকে সুবিধে মত একটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে. পরোপকার করবার সুবর্ণ সুযোগ একটা সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুব যে কঠিন তা নয়, কিন্তু যেমন সুবিধে এলেও, হাতের লক্ষ্মী পায়েই তাঁকে ঠেলতে হবে। পায়ের মইয়ে হাত দিতেও পারবেন না। বাধ্য হয়ে নিতান্ত দুখের সঙ্গেই ঐ পরোপকারে তাকে বঞ্চিত থাকতে হবে—কেবল বঞ্চিত না, প্রবঞ্চিত বলা উচিত। এই দেহ নিয়ে মই বেয়ে ওঠা কি তাঁর সাধ্য? সা তাঁর ঐ বপুকে ঠেলে তোলা কোন পার্থিব মইয়ের ক্ষমতা? না, এ জাতীয় পরোপকার স্পৃহা তাঁর সংবরণ করাই সমীচীন…এ-সব তাঁর নাগালের বাইরে।

না আর পরোপকার নয়। কাল থেকে ফের তিনি মাছের ঝোল ভাতে ফিরে যাবেন—চির পুরাতন সেই সাবেক জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন। পৃথিবী পড়ে পড়ে পচুক, মানুষরা সব গোল্লায় যাক, তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ফিরেও তাকাবেন না তিনি। পরোপকারের জন্যে প্রাণ দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তার বেশি—প্রাণদানেরও বেশি, এগুতে তিনি অপারক। কিছুতেই তিনি গোঁফ বিসর্জন দিতে পারবেন না, প্রাণান্ত হতে সক্ষম হলেও, গোঁফান্ত হতে তিনি একান্তই নারাজ। তাতে কারো পরোপকার হলো চাই নাই হলো।

হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা

হর্ষবর্ধনের বাড়ি চেতলায়। বাড়ির পিছনের ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে করাত দিয়ে কাঠচেরার এক কারখানা তিনি বানিয়েছেন। তাঁর অপিস-ঘর বাড়ির একতলায়।

হর্ষবর্ধন একদিন অফিসে বসে আছেন, হিসাব দেখছেন কারবারের। এমন সময়ে একটা লোক তাঁর দরবারে এসে দাঁড়াল। নিজের এক দরকার নিয়ে বলল, বাবু, আপনার বাড়ির সামনের অতবড় রোয়াকটা ত একদম ফাঁকা পড়ে থাকে, ওখানে আমার মিঠাইয়ের দোকান খুলতে দেন না একটা।

'কিসের মেঠাই, হর্ষবর্ধন শুধোন।

'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা, মতিচুর, দই রাবড়ি···' বলে যায় লোকটা।

হর্ষবর্ধন হাঁ করে শোনেন। শুনতে শুনতে তাঁর হাঁ যেন আরো বড় হয়ে ওঠে—'সন্দেশ দরবেশ······সন্দেশের দর যে বেশ তা আমার জানা আছে ভালই' তিনি বলেন।

'আবার খাবো, দেদার খাবো,······হরেক রকমের মেঠাই বানাব আমরা।' জানায় লোকটা।

'আবার খাবো আমরা দেদার খেয়েছি।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন: 'ভীম নাগের দোকানের।'

'আবার খাবেন এখানে। আবার খাবার পরে আরো আছে—দেদার খাবো, আমাদের নিজেদের বানানো। আনকোরা নিজস্ব পেটেন্ট।' লোকটি প্রকাশ করে: দেদার খেতে হবে—এমনি খাসা মেঠাই মশাই!'

বাঃ বাঃ! সে তো খুব ভাল কথা।' বলে হর্ষবর্ধনের খট্‌কা লাগে—'প্রত্যেক খাবারটাই তো পেটেন্ট। পেটে দেবার জন্যই তো সব। তাই নাকি? তাহলে?'

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে লোকটি বলে: 'পেটেন্ট মানে পেটে না দিয়ে রক্ষে নেই। তা বাবু দোকান ঘরের জন্যে আমরা কোন সেলামি-টেলামি দিতে পারবো না কিন্তু। এধারে দোকান-ঘরের দরুণ সবাই সেলামি চায়—পাঁচ-দশ হাজার টাকা। অত টাকা আমরা কোথায় পাব বাবু? তাই আপনার দুয়ারেই এলাম। সেলামি দেব না, তবে ভাড়া দেব যা ন্যায্য হয়। আর সেলামির বদলি আপনাকে সন্দেশ খাওয়াব রোজ রোজ—তার কোন দাম লাগবে না আপনার।'

তোমাকে কোন ভাড়াও দিতে হবে না তাহলে। হর্ষবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে তার আর্জি মঞ্জুর করেন: 'আমার রোয়াক তো ফাঁকাই পড়ে আছে অমনি। তোমার কাজে যদি লেগে যায় তো মন্দ কি।'

কাঠের তক্তা দিয়ে ঘরের মতন করে দোকান বানিয়ে নেব আমরা নিজের খরচায়। আর সেই দোকান ঘরে আমি আর আমার ছেলে মাথা গুঁজে পড়ে থাকব। আমি আর ছোটকু দুজন তো লোক মোট আমরা।'

আমার বাড়ির পিছনে কাঠের কারখানায় তুমি তক্তাও পাবে—যত চাও। এনতার নাও আর বানাও তোমার দোকান। তক্তারও কোন দাম দিতে হবে না তোমাকে।'

ব্যস্, বসে গেল মেঠাই-এর দোকান। হর্ষবর্ধনের আপিস ঘর সন্দেশের গন্ধে ভুর-ভুর করতে লাগল। আর তিনি সেই গন্ধে মাত হয়ে আরাম কেদারায় কাত হয়ে আবার খাব দেদার খেতে লাগলেন। দেদার খাব-ও খেলেন আবার—আবার।

অসন্তোষ প্রকাশ করল গোবর্ধন।—'দাদা তুমি এসব কী বাধালে বল দেখি!'

'কেন কী বাধালাম ?' শুধালেন দাদা।

'এই রোয়াক জোড়া মেঠায়ের কারবার। পেছনে ত কাঠের কারখানা বাধিয়েছেই। এবার সামনেও একটা কাণ্ড বাধাও! কাণ্ডকারখানা কোনটারই তুমি রাখলে না।'

'কাণ্ড না বলে প্রকাণ্ড বল। কত বড় বড় সন্দেশ বানায় দেখেছিস ? এক একটার দাম নাকি আট-আট আনা।'

'রোয়াকে বসে পাড়ার ছেলেদের ড্যাংগুলি খেলা দেখতাম তাতেও তুমি বাগড়া দিলে শেষটায়। ফোঁস ফোঁস করে গোবরা।

'আঁপসোস করিসনে। ডাণ্ডাগুলি চোখে দেখার চেয়ে সন্দেশগুলি চেখে দেখা ঢের ভাল রে। যত খুশি খা না সন্দেশ পয়সা লাগবে না তোর। আমাদের জন্যে বড় করে স্পেশাল সাইজের বানায় আবার।'

'খাব কেন অমনি ? খেতে যাব কেন ? আমাদের কি কিনে খাবার পয়সা নেই নাকি ? আমরা কি গরীব ? পরের মিষ্টি খাব কেন অমনি অমনি ?'

'মিষ্টি ত পরের থেকেই খেতে হয় রে বোকা। যে মিষ্টিই বল না, পরের পেলে, পরের খেলে মিষ্টি লাগে আরো যদি তা অমনি মেলে আবার। দেখিস না খেয়ে তুই একদিন। তা যদি না হবে তো বড় লোকেরা নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে গণ্ডে পিণ্ডে গিলে আসে কেন বলতো ? তাদের কি পয়সার অভাব ? বাড়িতে কি খেতে পায় না নাকি ?

'অমনি অমনি পরের মিষ্টি খাব তাই বলে ? দাদা, তুমি চেতলায় এসে ভারী হীনচেতা হয়ে পড়েছ দেখছি ?'

'অমনি কিসের ! ভাড়ার বদলি তো।' দাদা জানান ঃ 'ওইটুকুন রোয়াক-এর ভাড়া হ'ত নাকি মাসে তিনশ টাকা আর সেলামি অন্ততঃ তিন হাজার, লোকটাই বলেছে আমায়। তার বদলেই দিচ্ছে তো। ওই যে ভাঁড় ভাঁড় সন্দেশ দেয়, আসলে তা হচ্ছে দোকানের বদলে ওর সন্দেশের ভাড়া।'

এমন সময় দোকানদার প্রকাণ্ড এক রেকাব ভর্তি সন্দেশ এনে দুজনের সামনে রাখল ঃ 'আমার একটা আর্জি ছিল কর্তা!'

হর্ষবর্ধন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে কান খাড়া করলেন—'শুনি তোমার আর্জি।'

'আমার ভাইঝির বিয়ে—দিন দুয়ের জন্যে দেশে যেতে হবে। কাছেপিটেই—এই হাওড়াতেই বিয়ে। বেশী দূর না। আমার ছেলে আর আমি দুজনাই যাব—এই সময়টা আমার দোকানটা দেখাশোনার ভার কার ওপর দিয়ে যাই তারই একটা পরামর্শ নেবার ছিল আপনার কাছে।

'কেবল চোখে দেখার ভাব হলে নিতে পারতুম আমরা।' হর্ষবর্ধন বলেন—'কিন্তু—' একটু কিন্তু হয়েই থামতে হলো তাঁকে। 'আজ্ঞে সেই ভারই ত নিতে বলছি আপনাদের—ঐ চেখে দেখার ভার।' চাখবেন বইকি, হরদমই চাখবেন! যখন খুশি তখনই, সেই সঙ্গে দোকানটায় বসে একটু চোখে দেখতেও হবে, চোখও রাখতে হবে তার ওপর।'

'চোখ রাখতে হবে! কার ওপর? মেঠাই মণ্ডার ওপরেই ত?' গোবর্ধনের প্রশ্ন।

হর্ষবর্ধন বলেন, সে আর এমন শক্ত কি? মেঠাই-মণ্ডা সামনে থাকলে নজর কি আর অন্যদিকে যায় কারো ভাই।'

'আজ্ঞে নজর রাখতে হবে পাড়ার ছোঁড়াদের ওপরেই।' জানায় দোকানী ঃ তারা বড় সহজ পাত্র নয় মশাই।'

'তা আপনার ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রেখে যান না? বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সে আর করবেটা কি? ছেলেরাই ভাল নজর রাখতে পারে ছেলেদের ওপর।' গোবর্ধন বাতলায়।

ছোটকা থাকবে দোকানে? তাহলেই হয়েছে। এই দুদিনেই আমার দোকান ফাক হয়ে যাবে মশাই। সেই জন্যেই তো আরো ওকে এখানে না রেখে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি! ওর যা এক-একজন বন্ধু

আছে জানেন, দেখতেন যদি, ঘেঁাংকা, হোঁংকা, কোঁংকা—কী সব নাম যেন। কিন্তু এক একটি চীজ ভারী ইতর তারা। ও তাদের লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাওয়ায় রোজ।'

ছোটকা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব, প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু বাধা পায় হর্ষবর্ধনের কথায়—

'তা, ইতর লোকদের জন্যেই ত মেঠাই-মণ্ডা মশাই। শাস্ত্রে ত বলেই দিয়েছে মিষ্টান্ন মিতরে জনা। অর্থাৎ কিনা, মিষ্টান্নম্···ইতরে জনা··'

ছেলেটি বলে ওঠে : 'মোটেই তারা ইতর নয় বাবু। তারা আমার বন্ধু সব। শোনো বাবা, বাবুর মুখেই শোনো—তোমার শাস্তরে কী বলছে—শোনো ওঁর মুখে। মিষ্টান্ন—মিতরে জনা। মানে কিনা, তোমার মিতাদের জন্যেই যত মিষ্টি। তাদের তুমি খুব কসে মিষ্টি খাওয়াও। মিতা মানেই মিত্র। আর, মিত্র আর বন্ধু এক কথা—তাই নয় কি বাবু?'

গোবরা সায় দেয়—'ঠিক কথা, যাকে বলে মিতা, তাকেই বলে মিত্র, তাকেই বলে বন্ধু, ইংরেজিতে আবার তাকেই বলে ফেরেণ্ডো।'

'ওর ফেরেণ্ডোদের ঠ্যালাতেই আমায় ভেরেণ্ডা বাজাতে হবে মেঠাইয়ের দোকান তুলে দিতে হবে। হয়ত পাট তুলতেও হবে না, আপনিই উঠে যাবে দোকান। ছোটকাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর ঘাড় ভেঙ্গে বজ্জাতগুলো রোজ রোজ যা রসগোল্লা পান্তুয়া সাবাড় করে যায়—কী বলব বাবু।'

'তা বেশ ত। দুদিনের জন্যেই যাচ্ছেন ত।' গোবর্ধনের বুঝি সহানুভূতি জাগে—'এই দুদিন না হয় আমিই দেখব আপনার দোকান।' এমন আর কি শক্ত কাজ। রসগোল্লার দাম দু আনা, সন্দেশের দাম ঐ, পান্তুয়ার দাম ঐ। নগদ দাম নিয়ে বেচতে হবে—এই ত ব্যাপার। তা এ আর এমন শক্ত কি?'

'সেই সঙ্গে আবার নজরও রাখতে হবে যে।' মনে করিয়ে দেয়

মেঠাইওলা।

'ঐ তিনজনের ওপরেই ত। কী বললেন—হোঁৎকা, ঘোঁৎকা—আর কোঁৎকা—তাই না? অবশ্যি, 'আমি চিনি না তাদের কাউকে, তবে নামেই বেশ মালুম হচ্ছে। হোঁৎকা চেহারার কেউ এলে তাকে আর ঘেঁষতে দেব না দোকানে—সেইটাই হোঁৎকা হবে নিশ্চয়। আর ঘোঁৎকা নিশ্চয়। ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে আসবে—নইলে আর নাম ওরকমটা হলো কেন?—ওর আওয়াজেই টের পাওয়া যাবে। আর কোঁৎকা যদি আমার ত্রিসীমানায় আসে—আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করে যদি, এইসা এক কোঁৎকা লাগাব ওকে যে নিজের নাম ভুলে যাবে বাছাধন।'

'ব্যস! তাহলেই হবে! হাসিখুশির প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠল দোকানদার—কাল দুপুরের গাড়িতে যাচ্ছি আমরা। আপনি দুপুর থেকেই বসবেন তাহলে। কাল পরশুটা কেবল। তার পরদিন ভোরেই আমরা ফিরে আসছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—এবার গোবরা একটু কিন্তু কিন্তু করে—'দেখুন মেঠাই খেতে জানি, বেচতেও পারি হয়ত, কিন্তু বানাতে জানি না যে. সেটার কী হবে?'

'দুদিনের মতন সন্দেশ রসগোল্লা আর পান্তুয়া বানিয়ে রেখে গেলাম। এক কড়াই পান্তুয়া, এক হাঁড়ি রসগোল্লা, আর এক খোরা সন্দেশ!'

'বেশ! বেশ! তাহলেই হলো! আমার কাজ ত এই দুদিন চোখে দেখা কেবল! তা আমি পারব খুব। তবে আমার চোখে দেখাটা তেমন হবে না হয়ত। দাদার মতন আমার তেমন হজমশক্তি নেইত বাপু!'

'তাহলে দয়া করে আপনিই বসবেন বাবু!' অনুনয় করল দোকানদার—হয়ত বা হর্ষবর্ধনের প্রতি একটু কটাক্ষ করেই মনে হয়।

পরদিন দুপুরে দোকানে বসেছে গোবর্ধন। খদ্দেরের তেমন ভীড়

থাকে না দুপুর বেলাটায়—বেচাকেনার হাঙ্গামা কম। মাঝে মাঝে অবশ্যি দু-একজন আসছিল বটে, একটা জিলিপি কি একটা বোঁদে কিনতে দু-চার পয়সার। কিন্তু দু আনার নীচেই কোন খাবার তৈরী নেই জেনে ফিরে যাচ্ছিল আবার।

খানিক বাদে একটা ছেলে এসে দাঁড়াল দোকানে সামনে। গোবর্ধনকে সেখানে বসে থাকতে দেখে ছেলেটি যেন একটু থতমত খেয়েছে বলে মনে হলো গোবরার।—কী চাই হে তোমার?' তাকে জিজ্ঞেস্ করেছে সে।

'পান্তুয়া খেতে এলাম।' সোজা বলল ছেলেটা।

'পান্তুয়া খেতে এলে? তার মানে?

'পান্তুয়া খাই যে! রোজই খাই ত।' ছেলেটি জানায়।

'রোজই খাও, বটে! তোমার নাম কি হোঁৎকা নাকি গো?'

'কেন, হোঁৎকা হতে যাবো কেন? পান্তুয়া খেলে কি কেউ হোঁৎকা হয় নাকি!' ছেলেটি যেন অবাক হয় একটু।

'না, তা কেন হবে। এমনি শুধোচ্ছিলাম।' জানায় গোবরা।

হোঁৎকা-কথিত ছেলেটির তবুও যেন আপত্তির কারণ যায় না— 'হোঁৎকা-পনাটা কোথায় দেখলেন শুনি?'

'তা বটে! ফড়িংয়ের মতই টিঙটিঙে—হোঁৎকা তোমাকে বলা যায় না বটে। তবে কি তুমি কোঁৎকা।'

'রামো! কোঁৎকা আমার চোদ্দ পুরুষের কেউ নয়!'

'তবে তোমার নামটা কি জানতে পারি একবার?'

'আমার নাম মশা। বুঝলেন মশাই।'

'মশা! অদ্ভুত নাম ত। গোবর্ধন অবাক হয়: 'এ রকম ত কখনো শুনিনি ভাই! তা, এমন নাম হবার কারণ?'

'শুনেছি আমি নাকি ছোটবেলায় মশার মতন পিনপিন করে কাঁদতাম, তাই আমার ওই নাম হয়েছে।'

'তা হতে পারে।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়েঃ 'তা পান্তুয়া খাবে যে,

পয়সা এনেছ সঙ্গে ?'

'পয়সা কিসের ? আমি ত অমনি খাই। রোজ-রোজই খেয়ে থাকি।'

'না, অমনি খাওয়া চলবে না বাপু। পয়সা দিতে হবে, দাম লাগবে তোমার খাওয়ার।'

'বারে, মালিকের ছেলের সঙ্গে ভাব আছে, পয়সা লাগে না আমার শুধোন না দোকানের মালিককে ?'

'মালিক নেই—সে হাওড়া গেছে তার ভাইঝির বিয়েয়।'

'মালিক হাওয়া হয়ে গেছে ? কী বললেন আঁা ?'

'হাওয়া নয় হাওড়ায় গেছে। ভাইঝির বিয়ে দিতে।'

'বেশ ত, তাঁর বদলি যিনি রয়েছেন, তাকেই শুধোন না কেন একজন ত আছেন তাঁর জায়গায়। আপনি ত দোকানের কর্মচারী—আপনি তার কী জানবেন। আমি এই পান্তুয়া খেতে বসলাম—যেমন খাই রোজ।' বলে সে পান্তুয়ার কড়াইয়ের কাছে বসে গেল ধপ্ করে।

'দাদা, ও দাদা।' হাঁক পাড়ল গোবরা—'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে। পান্তুয়া খেয়ে যাচ্ছে।'

'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে ? কী যে বলিস তুই ?'

ভেতরের গদির ঘর থেকে সাড়া এল দাদার।

'বসে গেছে পান্তুয়ার কড়ায়।' গোবরা জানায়।

'বসুক গে মশা আর কত খাবে।' দাদা জবাব দিলেন—'রসেই লেপটে যাবে। পান্তুয়ার গায়ে আর হুল বসাতে হবে না বাছাধনকে।'

'দেখলেন ত, কী বলল নতুন মালিক ?' বলে ছেলেটা টপাটপ মুখে পুরতে লাগল আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে।

হাঁ করে দেখতে লাগল গোবর্ধন। তার চোখের ওপর আধখানা কড়াই ফাঁক হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। খেয়ে দেয়ে সে চলে

যাবার খানিক বাদে আরেকটি ছেলে এল সেখানে।

'তুমি আবার কে বটে হে?' শুধাল গোবরা: 'হোঁৎকা-ফোঁতকাদের কেউ নয় তো!'

'আজ্ঞে না, আমি দোকানদারের আপনার লোক। তার মাস্তুতো ছেলে।'

'মাস্তুতো ছেলে! তা হয় নাকি আবার! কখনো তো শুনিনি। এমনটা কোন কালে হয়েছে বলে তো জানি না।'

'শোনেননি তো দেখুন এখন। মাস্তুতো ছেলে মানে, তার ছেলের মাস্তুতো ভাই। বুঝলেন এবার?'

'বুঝেছি। তা নামটা কি তোমার শুনি একবার?'

'আজ্ঞে, আমার নাম মাছি। আপনার রসগোল্লা খেতে এসেছি। রোজ রোজ আমি খাই এখানে এসে।' এই না বলে রসগোল্লার হাঁড়িটা টেনে নিলে সে।

'দাদা, ও দাদা!' আবার হাঁক পাড়ল গোবরা—'এবার মাছি এসে বসেছে তোমার রসগোল্লার হাঁড়িতে।

আপিস ঘর থেকে এবার রাগত গলা শোনা গেল দাদার 'তুই কি আমাকে কাজ করতে দিবি না নাকি? ইয়ারকি পেয়েছিস? একটা মাছি তাড়াতে পারছিসনে। তাড়িয়ে দে—সামান্য একটা মাছিকে তাড়াতে কতক্ষণ লাগে?'

'তাড়ানো যাচ্ছে না যে।' গোবরা জানায়: মোটেই সামান্য মাছি নয়।

'তাহলে বসতে দে মাছিকে। বলে আস্তাকুঁড়েতেই বসে, আর রসগোল্লা পেলে বসবে না।

'বসুক তাহলে। থাক রসগোল্লা।' বলে হাল ছেড়ে দেয় গোবরা। আস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা সাবাড় করে মুখ মুছে উড়ে যায় মাছিটা।

তার খানিক বাদে হাতের কাজ সেরে দাদা এসে হাজির সেখানে।

দোকানের হাল-চাল দেখে তার সারা মুখ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল ঃ 'বাঃ, খাসা চালিয়েছিস তো দোকান। বাহবা দিলেন তিনি গোবরাকে—'অর্ধেক মাল ত এর মধ্যেই বেচে ফেলেছিস দেখছি।'

'বেচতে পারলাম কই! মশা-মাছিতেই সাবড়ে দিয়ে গেল সব।'

'কী বললি! মশা মাছিতে সাবাড় করে দিয়ে গেল খাবার! বলছিস কিরে!'

'তবে আর বলছিলাম কি, এতক্ষণ হেঁকে হেঁকে তোমায়! তা তুমি ত কানই দিলে না। গেরাজ্জিই করলে না আমার কথা।'

'উড়ন্ত মাছি! উড়ন্ত মশা!'

'মোটেই উড়ন্ত নয় দাদা। রীতিমতন দুরন্ত। দুরন্ত মশা, দুরন্ত মাছি। দুপেয়ে সব।'

'মশা-মাছিদের পাল্লায় পড়ে একেবারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেছিস দেখছি।' হর্ষবর্ধন বলেন—'এরাই সেই হোঁৎকা-কোঁৎকার দল ত বুঝলি রে! দাঁড়া, এবার আমি বসছি দোকানে। অর্ধেক খেয়ে গেলেও অর্ধেক পড়ে আছে এখনো। নগদ দামে এটা বেচতে পারলেও লাভ না হোক দোকানের লোকসানটা বাচবে অন্ততঃ।'

গোবর্ধন উঠে দাঁড়াল। হর্ষবর্ধন বসলেন পাটিতে।

একটি ছেলে এসে পান্তুয়া চাইল এবার। গোবর্ধন বলল ঃ 'ঐ দাদা, আবার একজন এসেছে। ওদের জাত-গুষ্টিই নিশ্চয়।'

'তুমি কি পিপড়ে নাকি হে? জিজ্ঞাসা করেন দাদা। পিঁপড়ে মানে পিপীলিকা। সাধু ভাষায় কথাটা আরো পরিষ্কার করেন তিনি, মানে, এখানকার বেশির ভাগ লোকই তো মশক, মক্ষিকা, আর পিপীলিকা।'

'বেশির ভাগ লোকই পিপীলিকা।'

'কেন কথাটা কি ভুল হলো নাকি? লোকদের ইংরাজিতে কী বলে শুনি? পীপল বলে না!'

'গাছকে ত বলে থাকে জানি।' ছেলেটি জানায়ঃ বলে পিপুলের গাছ।'

'তা তোমার লোকেরা মশা মাছি না হোক, এখানকার বালকরা ত বটেই।' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন এবার।

'কিন্তু, আমি পিঁপড়ে হতে যাব কেন শুনি!' আমি ত পান্তুয়া কিনতে এসেছি।'

'ও পান্তুয়া কিনবে! তা বেশ বেশ।' উৎসাহিত হন এবার হর্ষবর্ধন—'কত পান্তুয়া চাই তোমার।'

'কিলো খানেক।'

'পাঁচ টাকা দাম পড়বে কিন্তু।'

'পড়বে ত কি হয়েছে! দেব দাম।' ছেলেটি বলল ঃ পান্তুয়ার কিলো পাঁচ টাকা করে—তা কে না জানে।'

'যাক্, কেনার বদভ্যেস আছে তাহলে তোমার—ভাল কথা।'

একটা বড় ভাঁড় ভর্তি কিলো খানেক পান্তুয়া ওজন করে তার হাতে তুলে দিলেন হর্ষবর্ধন—'এই নাও। দামটা দাও ত দেখি এবার।'

'না, এ পান্তুয়া আমি নেব না। কেমন যেন দেখছি পান্তুয়াটা। খাবলানো খাবলানো।' ছেলেটি বিরস মুখে ফিরিয়ে দেয় ভাঁড়।

'হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ। একটা মশায় একটু আগে খাবলে গেছে ওগুলো।' গোবর্ধন সায় দেয় তার কথায়।

'মশায় পান্তুয়া খায়! বলছেন কি আপনি! অবাক হয় ছেলেটা, তারপর নিজেই সে তার কথার জবাব দেয়ঃ 'তা খেতেও পারে মশাই। চেতলার মশার অসাধ্য কিছু নেই। শুনেছি একবার তেতলার থেকে একটা লোককে চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে গেছিল হাজার হাজার মশায়। তারপর তার রক্ত শুষে খেয়ে না, ছিবড়েটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছল রাস্তায়। শুনেছি বটে।'

'তুমি তা শুনেছ কেবল। আমি নিজের চোখে দেখলাম।'

গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

'তাহলে ঐ পান্তুয়া আমার চাইনে। আপনারা আমায় কিলো খানেক রসগোল্লা দিন ওর বদলে। তার দামটা কত পড়বে?'

'রসগোল্লা পান্তুয়া ঐ একই দাম। ঐ পাঁচ টাকাই। দু আনা করে পিস যখন দুটোরই।'

'রসগোল্লাটা আবার মাছি বসা নয়ত মশাই?'

'ধরেছ ঠিক।' বলল গোবরা—'মাছি বসাই বটে।'

'আপনারা মাছি বসানো রসগোল্লা দিচ্ছেন আমাকে। মাছিরা যেখানে সেখানে—যতো নোংরা জায়গায় গিয়ে বসে। যতো বীজাণু কীজাণু নিয়ে আসে। খেলে অসুখ করে। নাঃ আপনি ওর বদলে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিন আমায়। সন্দেশও ঐ দু আনা করেই পিস ত।'

'হ্যাঁ, বলে ঘাড় নেড়ে হর্ষবর্ধন তাকে খোরার থেকে চুবড়ি ভরে সন্দেশ সাজিয়ে দেন। সন্দেশের চুবড়ি নিয়ে ছেলেটি চলে যেতে উদ্যত হয়।

'ওহে দামটা দিয়ে গেলে না' বাধা দেয় হর্ষবর্ধন: 'আসল কাজই ভুলে যাচ্ছ যে।'

'কিসের দাম?' চুবড়ি হাতে ফিরে দাঁড়াল ছেলেটা।

'সন্দেশের দামটা।'

'সন্দেশের দাম দিতে যাব কেন? সন্দেশ ত আমি রসগোল্লার বদলে নিলাম।'

'বেশ, রসগোল্লার দামটাই দাও তাহলে।'

'রসগোল্লা ত আমি পান্তুয়ার বদলেই নিয়েছি।'

'আহা, পান্তুয়ার দামটাই দাও না গো।'

'পান্তুয়ার দাম দিতে হবে কেন শুনি?' ছেলেটি ভারী বিরক্ত হয় এবার। পান্তুয়া আমি নিলাম কখন। ও ত আমি নিইনি। যা নিলাম না, তার আবার দাম দেব কেন?' যা নিইনি, তারও দাম দিতে

হয় নাকি ?'

ছেলেটি চলে যায় দেখে হর্ষবর্ধন তাকে ফিরে ডাক দেন আবার—'ওহে, শোনো শোনো। দাম চাচ্ছিনে, একটা কথা কেবল জানতে চাইছি। একটু আগে যারা মশা মাছির ছদ্মবেশে এসে খেয়ে গেছে, তাদের নাম কি হোঁৎকা আর···?'

'আর ঘোঁৎকা। ধরেছেন ঠিক।' ছেলেটি ফিক্ করে হেসে ফ্যালে।

'আর তোমার নাম ?'

'আর আমি হচ্ছি কোঁৎকা।' যেতে যেতে চুবড়ির থেকে সন্দেশ খেতে খেতে বলে যায় ছেলেটা। কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলতে গিলতে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হতবাক হয়ে থাকেন।

'গেছে, তার জন্য মন খারাপ কোর না দাদা।' গোবর্ধন সান্ত্বনা দেয় দাদাকে—'তোমাকে ত আমার মতন তেমন ল্যাজে গোবরে হতে হয়নি। তাহলেও বলতে হয় দাদা, তোমার এই কোঁৎকাটাই ভারী জবর হয়েছে। তাই না দাদা ?'

নিজের ল্যাজের গোবরটাই যেন দাদার মুখের উপর ভাল করে লেপে দেয় গোবরা।

'কোঁৎকা দিয়ে গেল বলছিস কিরে। কোঁৎকার ওপর আরো কোঁৎকা লাগিয়ে গেল আমায় !' হা-হুতাশ করেন দাদা : 'আধ খোরা সরেশ সন্দেশ নিয়ে গেল ছোঁড়াটা। আমার—আমার একবেলাকার খোরাক !'

গোবরধনের প্রাপ্তিযোগ

কী যেন কাজে ভাইকে ল্যাজে বেঁধে হর্ষবর্ধনকে যেতে হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে—যেতেই এবার নোটিসটা নজরে পড়ল তাঁর। এর আগে পড়েনি কখনো আর।

'ছাখ, ছাখ, দেখেছিস!' নোটিস বোর্ডটার দিকে গোবরার চোখে আঙুল দিয়ে দেখান--'ওড়ে ছাখ।'

'বিজ্ঞাপন তো!' গোবরার মুখ বিকৃতি দেখা যায় 'পড়বার কি আছে।'

'অনেক কিছু। ইস্কুলের লেখাপড়ায় কি আর শেখায়? দুনিয়ার হালচাল জানা যায় কিছু। কিছু না। যা কিছু শেখার এই সব বিজ্ঞাপন দেখেই, এর থেকেই শেখা যায় জানিস?'

'তুমি ছাখো দাদা! তুমিই শেখো। তুমি শিখলেই হবে। বিজ্ঞাপনসহ বিজ্ঞ আপন দাদাকেও যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

'কাল ওটা না দেখেই যা শিক্ষালাভ হয়েছে আমার না।' বলেই তিনি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলেন—আগে দেখলে কাজ দিত। এখন খালি হাহুতাশ করা।

কথাটা হেঁয়ালির মতন লাগে যেন গোবরার—কি হয়েছিল কালকে। সে জানতে চায়!

আমাদের ঠাকুরমশাই দেশে গেলেন না কাল? তাঁর টিকিট কাটতে গেছলাম শেয়ালদায়···তখন যদি সামনের ঐ বিজ্ঞাপনটা আমার চোখে পড়তো···'

তুমি অবাক করলে দাদা! শেয়ালদায় গিয়ে তুমি হাওড়ার

বিজ্ঞাপন দেখতে চাও? যতই তোমার দূরদৃষ্টি থাক না দাদা। তা, কি কখনো হতে পারে? দাদার ইতিহাস আর ভূগোলে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সেটা সে না দেখিয়ে পারে না।

'সেই তো দূরদৃষ্ট আমার! তবে আর বলছি কী!' বলে তিনি গতকালের বৃত্তান্তটা বিশদ করেন।

সেখানেও টিকিট ঘরের সামনে ঠিক এইরকম ভিড়—এখানকার মতই লম্বা লাইন। তিনি সেই কিউয়ের ভিড়ে গিয়ে ভিড়ছেন। একটা লোক এগিয়ে এলো অযাচিতই; এসে বলল আপনি মোটা মানুষ এর ভেতর গিয়ে কষ্ট করবেন কেন? আমায় দিন, আমি আপনার টিকিট কেটে দিচ্ছি। নিজের টিকিট তো কাটতেই হবে আমাকে, যেতেই হবে ওর মধ্যে।

তিনি তার হাতে টিকিটের টাকাটা দিয়েছেন। তারপরে কড়া নজর রেখেছেন তার ওপরে।

লোকটা ধীরে এগুতে থাকে। কিউয়ের লেজ ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর। সেই লেজ ধরে এগিয়ে চলেছে লোকটা। লাইনের লেজ মুড়ো দুদিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মধ্যে লেজ খেলে কোথায় যে লোপাট হলো তার পাত্তা পাওয়া চকিতের গেল না! নিমেষে হাওয়া!

এই বলে দাদা আবার সেই বিজ্ঞাপনটার ওপর নজর দেন, সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা, জ্বলজ্বল করছে এখনো—'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই রহিয়াছে, সাবধান!'

তারপর তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা ভাইয়ের ওপর টেনে আনেন—'এর মানে বুঝলি এবার?'

'বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে তুমি অমন করে সন্দেহ ভরে আমার দিকে তাকাচ্ছো যে?' ফোঁস করে ওঠে সে, 'আমি তোমার নিকটেই আছি বটে কিন্তু কোন চোর ছ্যাঁচোর নই—স্পষ্ট করে কই।

'সে কথা আমি বলেছি? চোরামি ঠকামি করতে বুদ্ধি লাগে—

সেই বুদ্ধি তোর ঘটে কই ? আর সে জন্যেই আমার এতো ভয় ! এই শহরের চতুর্দিকেই যত বদলোক'—হর্ষবর্ধনের বিস্তৃত বিবরণ—'অলিতে গলিতে পোস্টাপিসে ইস্টিশনে। শহরটার হাড়ে হাড়ে বদমায়েশি। পোস্টাপিসে যাও, কেউ না কেউ গায়ে পড়ে তোমার মণিঅর্ডার করে দিতে চাইবে। ইস্টিশনে গেলে তো কথাই নেই, সেখানে যেতো লোক টিকিট কেনার তালে ঘুরছে তাদের বেশির ভাগই টিকিট কেনার পাত্র না। ঐ রকম ভাব দেখাচ্ছে বটে কিন্তু কেউ তার নিজের টিকিট কিনবে না। পরের টিকিট কিনে দেবার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে তারা—একেকটা আস্ত জোচ্চোর। তাদের একটাকে কাটলে দু-খানা বদমায়েশ বেরোয়। এখানে যত ঘাঘী আর ঘুঘু আনাড়ীদের শিকার করার ফিকিরে ঘুরছে, আমি দেখে, এমন কি না দেখেই এখন থেকেই বলে দিতে পারি। এখন থেকে সাবধান।'

বলে হর্ষবর্ধন মুখখানা এমন ধারা করেন যে তাঁকে বিমর্ষবর্ধন বলে গোবরার ভ্রম হয়।

'তুমি কিছু ভেবো না দাদা। কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমিও বড়ো সহজ পাত্র নই।' ভাই দাদাকে ভরসা দিতে চায়।

হ্যাঁ, পারবে না। তোর দাদাকে, দাদার দাদা ঠাকুরদাকে পেলে ওরা ঠকিয়ে ছাড়বে। তোর আমার চেয়ে বড়ো বড়ো ওস্তাদকে ওরা ঘায়েল করছে হরবখত। চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—তাই করে বেঁচে রয়েছে ওরা। পারবে না।'

পারতপক্ষে ওরা কতো রকম পারে তার কতকগুলো দৃষ্টান্ত তিনি এনে খাড়া করেন তার পরে ! কেমন করে চকচকে পেতলকে সোনা চালাতে আসে, রাস্তায় কুড়িয়ে অমন সোনা-দানা কতো রাস্তায় বিলিয়ে দিতে চায়, দশ টাকার নোটকে চোখের ওপর ডবোল করে দেখিয়ে দেয়, তিনখানা তাস ফুটপাতে বিছিয়ে কতো রকমের কেরামতি করে—সেই কেরামতুল্লাদের কতো রকমের রোমাঞ্চকর কাণ্ডকারখানা তিনি কাহিনী পরম্পরায় বর্ণনা করে যান, এক বর্ণও যার নাকি

মিথ্যে নয়।

'মা-ও বলেছিল আমায়,' গোবরা জানায়—'যাসনে কলকাতায়। সেখানে ধরে নিয়ে আসে, এই এখানেই নিয়ে আসে আমাদের এই আসামে এনে আসামের চা-বাগানে চালিয়ে দেয় নাকি। অচল টাকার মতন।'

'তোর মা তো সব জানে। আমার কথা শোন।' মার কথার ওপর তিনি নিজের কথা পাড়েন—'সে দিতো আগে। চা-টা খাইয়ে বাগিয়ে নিয়ে চা বাগানে চালান দিতো বটে! তারপর চা-বাগিচায় জন্মভোর খাটো খাও, চা বাগাও, খেটে মরো। সে-সব ছিল আগে কিন্তু এখনকার এ-সব দৈত্য নহে তেমন। এরা তাদের ওপরে যায়। এবা তোকে আস্ত গিলবে। আস্ত রেখেই বার করে দেবে কিন্তু তুই ভেতর-ফোঁপরা হয়ে যাবি। তোকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে। গজভুক্ত কপিত্থ দেখেছিস? দেখিস নি? আমিও দেখিনি, তবে শুনেছি। গজরা আর বিদ্যাদিগ্‌গজরাই সে চিজ দেখেছে কেবল—সে ভারী ভয়ানক। দেখলে লোকে ভিরমি খায়! এ-সব ঠিক জোচ্চোররা তোকে সেই কপিত্থ করে দেবে। কপির চেয়েও তা খারাপ নাকি, তাই বানিয়ে দেবে তোকে। কোথাও তোকে চালান না দিয়েই তোর যা-কিছু সব আমদানি করে নেবে। তুই টেরটিও পাবি না। যদি পাস তো পাবি অনেক পরে, কিন্তু তখন পেয়ে আর লাভ?

দাদার মুখখানা এক গাদা প্রশ্নপত্র নিয়ে দেখা দেয়, যার কোন সদুত্তর গোবর্ধনের যোগায় না।

দাদার বলার পর থেকে দিনগুলো এমন ভয়ে ভয়ে কাটে যে রাস্তার বেরুলে সে ভয়ে ভয়ে হাঁটে, দেখে দেখে পা ফেলে, কি জানি কোনো আধুনিক ঠগীকে ভুলে মাড়িয়ে বসে। চারধারে তাকিয়ে চলে। ঐ জাতীয় কিছু তার পিছু নিয়েছে কিনা। কারু সঙ্গে একটা কথা কওয়ার তার সাহস হয় না। এমন কি পার্কে পার্কে যে সব প্রস্তর মূর্তিদের

সাক্ষাৎ পায়, তাদেরো যেন তার বিশ্বাস হয় না, তাদের কাছেও ফিসফিস করতে ভয় পায়।

আর প্রতিদিন বাড়ি এসে দাদার কাছে তার নিরাপদ ভ্রমন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে হয়। ঠগ জোচ্চোর দূরে থাক, পুলিস পাহারাওলাকে পর্যন্ত এড়িয়ে সন্দেহজনক সব কিছুর পাশ কাটিয়ে কেমন করে ফিরে এসেছে, তার রোমাঞ্চকর ফিরিস্তি! ঠগদের ঠোক্কর খাওয়া দূরে থাক, কারুকে একটুখানি ঠোকরাতে অব্দি দেয় নি।

কিন্তু একদিন ভারী গোলে পড়ল গোবরা। বেড়াতে বেরিয়ে ফেরার পথে মোড় ভুল করে গুলিয়ে ফেলল রাস্তা। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করে যে পথের নিশানা জেনে নেবে, সে ভরসা তার হয় না। সে পথ হারিয়েছে কেউ টের পেলে আর রক্ষে নেই। মা বলেছে চা বাগানের কথা, আর দাদা বলেছে টাকা বাগানোর ব্যাপার—দুটো কথাই বলতে গেলে এক কথা, সমান ভয়াবহ, বানানের সামান্য হেরফের মাত্র। তা বানানের এই তারতম্যে বানানো কোন ব্যতিক্রম হবে না। বেচারী গোবরাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে যে পথেই যাও।

সারা বিকেলটাই সে এ-পথে ও-পথে ঘুরে কাটাল, নিজের পথের কোন কিনারা পেল না। হঠাৎ তার খটকা লাগল কেমন। কে যেন তার পিছু নিয়েছে না!

পিছন ফিরে দেখল তাকিয়ে—তাই তো! অনেকক্ষণ থেকেই তো ওই লোকটা তার আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করছে, কিছু যেন তাকে বলতে চায়!

আর যায় কোথায়! দেখেই হয়ে গেছে গোবরার। তারপর যতই সে তার নজর এড়াতে চায়, এদিকে যায় ওদিকে যায়, দিগ্বিদিকে কেটে পড়ে, ততই যেন লোকটাকে আরো আরো দেখতে পায়। কি সর্বনাশ।

গোবর্ধন টক্ করে এক মেঠায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঠেন্

করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে এক ঠোঙা জিলিপি নিয়ে সামনের টেবিলে গিয়ে চিবুতে বসে যায়। ওমা! লোকটাও তার খানিক পরেই ঢুকেছে এসে সেখানে। আরেক ঠোঙা সিঙাড়া কচুরি নিয়ে বসে গেছে তার সামনে।

ঠক জুয়াচোর গাঁটকাটা নিকটেই আছে, সাবধান। বিজ্ঞাপনের কথাটা মায় দাদার সাবধান বাণী মিথ্যে না! ফাঁক পেলেই লোকটা এখন তার পকেট মারবে। যার-পর নাই হালকা করে দেবে তাকে। আধাবয়সী লোকটা—কেমন তার যেন।' গোবর্ধনের সামনে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারে আর অর্ধ-বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাতে থাকে যেন এমন আহামরি এর আগে আর কখনো সে দেখেনি জীবনে! এমন অস্বস্তি লাগে গোবরার। উস্‌খুস্‌ করতে থাকে।

'আপনার মুখ যেন খুব চেনা-চেনা ঠেকছে আমার। কোথাও যেন দেখেছি আপনাকে এর আগে?' কথা পাড়ে লোকটা।

'হুম্‌!' বলেই হুম্‌ করে উঠে পড়ে গোবরা। এক ছুটে বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। বলতে বলতে যায় মনে মনেই—আমার মুখ আগে দেখেছো বলছো তুমি। কিন্তু তোমার ঐ পোড়া মুখ আমি ঐ জন্মে দেখিনি কিন্তু না দেখেও চিনতে পেরেছি তোমাকে তুমি হচ্ছো একটি···আস্ত একটি···তা তুমি যাই হও, আর বেশি চেনাচিনির কাজ নেই, হাড়ে হাড়ে আর চিনতে চাইনে তোমায়। নমস্কার।

নমস্কার জানিয়ে সে দূরে সরে যেতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা তার অদূরেই থাকে। ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করে।

গোবরা নিরুপায় হয়ে একটা পার্কের চারধারে তিন চক্কর মেরে ভেতরে ঢুকে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে পড়ে। লোকটিও তার পাশে এসে বসে—সেই বেঞ্চেই।

এতো ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে এতো করে সে হারিয়ে যেতে চেষ্টা

করেছে. তবুও লোকটার দৃষ্টি এড়ানো যায় নি। বৃথা আর চেষ্টা না করে অসহায়ের মতো সেই বেঞ্চিতেই জড়োসড়ো হয়ে সভয়ে সে বসে থাকে। কি করবে?

বসেই না সে গাঢ় স্বরে ব্যক্ত করে, 'আপনাকে আমি চিনতে ভুল করিনি ছোটবাবু। আপনি মিত্তির বাড়ির ছেলে, কলকাতার কে না আপনাকে চেনে। দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছি।'

ও বাবা! লোকটি যে নিতান্তই শত্রুপক্ষের তা বুঝতে তার বিলম্ব হয় না।

'স্বর্গীয় দিগম্বর মিত্তিরের ছেলে আপনি। চিনেছি আপনাকে।' গোবরা চুপ করে থাকে। আপনি সম্বোধনে সে একটু খুশি হলেও আপনা-আপনি সম্বন্ধটা তার ভাল লাগে না।

'এতক্ষণ ধরে তাই তো ভাবছিলাম, কেন এমন চেনা চেনা ঠেকছে আপনাকে। চিনতে পারলাম এতক্ষণে। আপনাদের সেরেস্তায় সেদিন গেছি, তখনই তো দেখেছি আপনাকে। বেশি দিনের কথা তো নয়।'

গোবর্ধন তার প্রতিবাদে কেবল না-না আওড়াতে পারে কোন রকমে।

কিন্তু লোকটা তার না-কারকে আমল না দিয়ে আরো নানা কথা কইতে থাকে. 'আমার প্রস্তাবটা কি আপনি এর মধ্যে বিবেচনা করে দেখেছেন? আপনার বেলতলার বাড়িটা আমি কিনতে চেয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন ভেবে-চিন্তে পরে আমায় জানাবেন। আশা করি এখন আর আপনার কোন অমত নেই?'

গোবর্ধন বলতে যায়—কিন্তু আমি তো মশাই উক্ত চন্দ্রবিন্দু দিগম্বরের কোন দিগন্তেই যে সে-নই, এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল গোবরা, এবং সুবিধে পেলে, ন্যাড়া নয় যে তাকে বেলতলায় যেতেই হবে পৈতৃক বাড়ির কেনাবেচায় নিতান্তই এ কথাটাও সে জানাতো হয়তো কিন্তু কোন কথাই সে কইতে পারল না।

সে সুযোগই তাকে দিলেন না ভদ্রলোক। কোন কথা কানে না তুলে বলেই চললেন তিনি 'না আপনার কোন আপত্তি আমি শুনবো না। এখুনি কথাটার একটা নিষ্পত্তি আমি চাই। এই নিন পাঁচশ টাকা, ধরুন, আমার বায়নাস্বরূপ এটাই আপাতত দিচ্ছি না না, হাত নাড়লে হবে না, কোন কথা শুনছিনে আপনার। বাড়িটার ওপর ভারী ঝোঁক আমার গিন্নীর, বুঝেছেন? আর অমত করবেন না দোহাই! না হয় হাজার টাকাই বায়না নিন, তারপর দাম দর যা হয় বিক্রি করবার সময় চুকিয়ে দেবো আপনাকে। এখন এই হাজার টাকা আমার কাছে আছে· দয়া করে টাকাটা নিন, কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাক।

এই বলে ভদ্রলোক কোন ওজর না শুনে জোর করেই একতাড়া নোট গোবর্ধনের হাতে গুঁজে দিয়ে, পাছে দিগম্বর তনয় মত বদলে না ফেলে সেই ভয়ে, তক্ষুনি সেখান থেকে এক ছুটে পার্কের গেট দিয়ে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

গোবরা হাঁ করে বসে থাকে।

তারপর অন্যমনস্কের মতো চলতে চলতে এক সময় নিজের বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছয়।

হাঁ করে বসেছিলেন হর্ষবর্ধনও—গোবরার প্রতীক্ষায়। হারিয়ে গেল নাকি ছেলেটা? নাকি, কোন ছেলেধরার পাল্লায় পড়ে গেল? প্রায় ওকে খরচ লিখতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃবর এসে হাজির।

'কোথায় ছিলিস এতক্ষণ?'

'একটু ব্যবসা-বাণিজ্য করছিলাম দাদা।'

'ব্যবসা-বাণিজ্য? তোকে বার বার বারণ করে দিয়েছি না যে কোন ধড়িবাজের পাল্লায় পড়তে যাসনে। যত সব মোড়ল লোক ছেলেছোকরা দেখলে ব্যবসা বাণিজ্যের নাম করে ফাঁদ পেতে ফাঁকি ফোকরা দিয়ে টাকা আদায় করে এখানে। শেয়ার বেচার কেরামতি

দেখিয়ে লাটে তুলে দেয় কোম্পানি। পই পই করে বলিনি তোকে? সাধ করে তুই তাদের খপ্পরে পড়তে গিয়েছিস? কতো টাকা ঠকিয়ে নিলো শুনি? ক-শো টাকা গচ্চা গেল?

'গচ্চা যায়নি তেমন, বরং কিছু গছিয়ে দিয়ে গেছে আমায়। ঠকিনি বিশেষ। তবে দাদা, একটা কথা বলবো? ঠকার চেয়ে না ঠকানো বেশি শক্ত—এই জ্ঞান আমার হয়েছে।'

'এইমাত্র আমি আমার বেলতলার বাড়িখানা বেচে—বেচিনি ঠিক এখনো বেচার বায়না, বেশি নয়, এই হাজার খানেক নিয়ে আসছি। এই দেখো।'

এই বলে ফ্যানের হাওয়ায় ঘরের ভেতরে নোটের ঝুরি সে ওড়ায়।

'অঁ্যা। শেষটায় তুই আমার ভাই হয়ে স্বর্গত শ্রীমৎ পৌণ্ড্রবর্ধনের পুত্র হয়ে—বর্ধন-বংশের সন্তান হয়ে তুই কিনা ঠক জোচ্চোর হলি? লোক ঠকাতে শুরু করলি শেষটায়?

ভুরি ভুরি নোট তাঁর চোখের উপর উড়ি-উড়ি আর তার নিজের চোখ ভুরুর কড়িকাঠে।

একটা চোর জুয়াচোর তাঁর এতো নিকটে এমন কাছাকাছি একেবারে বংশের মধ্যে এসে পড়বে, এ যেন তিনি ভাবতে পারেন নি। সেই ধারণাতীত দৃশ্য অবধারণ করেই তিনি হিমসিম খান।

'আমি ঠকিয়েছি কিনা ঠিক বলতে পারি না। তবে আমি লোকটাকে না ঠকাতেই চেয়েছিলাম। যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম দাদা! এমন কি এ কথাও বলেছিলাম দিগম্বর মিত্তিরের কোন পুরুষের আমি কেউ নই। কিন্তু লোকটা আমার কথায় কানই দিল না, কি করবো?'

————

● ● ● ● ● ● ●

হর্ষবর্ধনের চৌকিদারি

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দু'ভাই বেরিয়েছেন বাজার করতে। সামান্য যা-তা কিনতে নয়, ঘর-জোড়া প্রকাণ্ড কেনা-কাটার ব্যাপারেই তাঁরা বেরিয়েছেন। একটা চৌকি কেনার দরকার।

হর্ষবর্ধনের নিজের জন্যেই দরকার। গোবরার সঙ্গে এক খাটে শোয়া তাঁর পোষাচ্ছে না আর। ঘুমোলো তো দিগ্বিদিক জ্ঞান লোপ পায় গোবরার। কথায় বলে, ঘুমন্ত না মড়া, কিন্তু ঘুমোলেই যেন গোবর্ধন ভায়া বেশি সজীব হয়ে উঠতো। তখন তার হাত-পা ছোঁড়ার বহর দেখে কে। গোবর্ধনের সঙ্গে গুঁতোগুঁতিতে পেরে উঠছেন না হর্ষবর্ধন। সারারাত যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিংবা আত্মরক্ষার মহড়া দিয়ে কাটাবেন, তাহলে ঘুমোবেন তিনি কখন?

এই কাল রাত্রের কথাই ধর না কেন? বেশ ঘুমোচ্ছেন, প্রায় মড়ার মতই; নির্বিবাদেই ঘুমিয়ে যাচ্ছেন; এমন সময়ে, বলা নেই, কওয়া নেই গোবর্ধন তাঁর সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি বাধিয়ে বসেছে। গোবরার ওই নিরেট মাথার সঙ্গে ঠোক্কর লাগলে, ঘুম তো ঘুম, ঘুমের বাবা অবধি চুরমার হয়ে যায়, হর্ষবর্ধনেরও তাই হয়ে গেল।

এক হাতে নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, অপর হাতটি তিনি বাড়িয়েছেন গোবরার উদ্দেশ্যে। না, ওটার কষে কান মলে দেওয়া দরকার এক্ষুনিই—কাল-বিলম্ব না করে। এবং কানটাকে বেশ বাগিয়ে ধরেছেন, হাতে-নাতেই পাকড়েছেন, যুৎসই করে মলতেও শুরু করেছেন, কিন্তু গোবরার কোন উচ্চবাচ্য নেই অনেকক্ষণ। অবশেষে ঘুমের ঘোরেই তার আর্তনাদ শোনা যায়ঃ 'আহ!'

আওয়াজটা আসে কিন্তু হর্ষবর্ধনের পায়ের দিক থেকে।

হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই হাত বাড়িয়েছিলেন করমর্দনের জন্য। চক্ষুলজ্জার যে কোন কারণ ছিল তা নয়, তবে কানমলা এমন কি কাণ্ড যে তার জন্যে আবার কষ্ট করে চোখ খুলতে হবে? এখন চোখ খুলে এবং কেবল খুলে নয়, চোখ পাকিয়ে, ভাল করে তাকিয়ে দেখেন, কান মনে করে এতক্ষণ প্রাণপণে গোবরার পায়ের বুড়ো আঙুল তিনি দলেছেন।

ভাইয়ের পদাঘাতেও তিনি ততটা অপমান জ্ঞান করেননি, কিন্তু ভুলবশতঃ ভাইয়ের পদসেবা করে ফেলে তখন থেকে তিনি ভারি মর্মাহত হয়ে রয়েছেন। কায়ক্লেশে কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে সকালে উঠেই তাঁর প্রথম প্রতিজ্ঞা হয়েছে, খাট হোক, পালঙ্ক হোক, তক্তপোশ হোক, চৌকি হোক—নিদেন পক্ষে জলচৌকি, এমন কি বেঞ্চি হয় সেও স্বীকার নিজের আলাদা শোবার জন্যে একটা কিছু না কিনে আজ আর তিনি বাড়ি ফিরছেন না। এমন কি যদি কেবল সিংহাসনই পাওয়া যায়, তাছাড়া সামান্যতব বস্তু যদি এই কলকাতায় আর নাই মেলে, তবু তিনি পেছপা হবার নয়, তা যত টাকাই লাগুক, তিনি মরীয়া আজ।

'ও-ধারের ওই দোকানীটা ভারি সোরগোল লাগিয়েছে, চলতো দেখি গে, কী ব্যাপার।

এই বলে হর্ষবর্ধন ফুটপাথের কিনারায় এসে রাজপথে পদক্ষেপের আগে গোবর্ধনকে হস্তগত করতে চেয়েছেন।

গোবর্ধন কিন্তু দাদার হাতে যেতে রাজি হয়নি। সে কি কখনো সেই ছোট্ট ছেলেটি রয়েছে নাকি যে, বড় ভাইয়ের হাত ধরে রাস্তা পারাপার করবে? দাদার করায়ত্ত হবার পাত্র আর সে নয়। দাদার সঙ্গে করমর্দন করবার গোবরার একেবারেই আগ্রহ নেই, সেজন্য হাতাহাতি করতে হয় সেও ভাল। আপত্তি করেছে সে, করবেই ত:

'আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি এক ছুটে, তুমি দেখ না!'

দাঁড়া দাঁড়া! এ তোর গৌহাটির রাস্তা পাসনি, আসামের জঙ্গলও না চলে গেলেই হলো? দেখছিস নে চারিদিকে কি রকম মোটর, টেরাম আর দোতলা গাড়ি। একদম খোয়া যাবি যে! বিদেশে এসে বেঘোরে চাপা পড়বি।'

হ্যাঁ, চাপা পড়লেই হলো। পৃথিবীটাই যেমন পড়েছে তেমনি সোজা আর কি!' গোবরা তথাপি প্রতিবাদ চালায়।

'পৃথিবী! পৃথিবী চাপা পড়ল?' বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করেন হর্ষবর্ধন: 'কবে পড়ল? পৃথিবীতে আবার চাপল কে?'

'বাঃ, জানো না? পৃথিবী যে উত্তর-দক্ষিণে চাপা, কমলা লেবুর মত—জানানো বুঝি!'

'অতো ভূগোলের বিদ্যে ফলাসনে—'হর্ষবর্ধনের—ভারি রাগ হয়ে যায় এবার: 'পাগল বলবে লোকে!' গোবরার উত্তর শুনে তার ইচ্ছে করে তক্ষুনি রীতিমত দক্ষিণে দিয়ে দেন ওকে, তাঁর দক্ষিণ হাতের বিরাশী সিক্কের আন্দাজে।

কোন কথায় কর্ণপাত না করে হর্ষবর্ধন ভাইকে সবলে মুঠোর মধ্যে এনেছেন, তারপরে চারিদিকে ভাল করে ভ্রূক্ষেপ করে দুধারের ধাবমান মোটর ট্রাম, দোতালা বাস, সাইকেল এবং গরুর গাড়ি সন্তর্পণে বাচিয়ে, কখনো ঈষৎ ছুটে, কখনো থমকে থেমে, কদাচ একটা লাফ মেরে, অকস্মাৎ বা এক পাক ঘুরে গিয়ে অতি সাবধানে, কোনরকমে অন্য তরফের ফুটপাতের নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। হয়েছেন এবং নির্বিঘ্নে হাঁফ ছেড়েছেন।

'আর কিছু না।' দাদার বাহু পাশমুক্ত হয়ে গোবর্ধন ব্যক্ত করে: 'গানবাজনার দোকান, দাদা!'

অ্যাঁ! তাইত! হর্ষবর্ধন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন: 'কলের গানই ত লাগিয়েছে দেখছি! অবাক কাণ্ড! কলকাতার কায়দাই আলাদা? গান বাজিয়ে কান মলে পয়সা নিচ্ছে! আশ্চর্য! কিন্তু যাই বল গোবরা, শুনতে মন্দ না নেহাত! তোর বৌদির গলার চেয়ে

ভাল—ঢের ঢের ভাল।'

গোবরা বৌদির ওকালতি করতে গেছে ঃ বৌদি এখানে নেই কিনা তাই বলছ।'

'যাঃ যাঃ, তোকে আর সাউগুরি করতে হবে না। তোর বৌদি কাছে থাকলেই আমি ভয় খেতাম, ভয় খাবার ছেলে নই আমি, কেউ ভয় দেখাতে পারে না আমায়। তাহলে তোর বৌদির ওই জাঁহাবাজী গলা শুনেই ঘাবড়ে গিয়ে মারা যেতাম য়্যাদ্দিন—হ্যাঁ।'

'কেন, বৌদির গান কি খুব মন্দ?'

'চেহারাই বা এমন কী খারাপ? কেবল দুঃখ এই, চোখ বুজে থাকা যায় কিন্তু কানের বোজা যায় না কিছুতেই।' হর্ষবর্ধন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন ঃ 'চল, ভেতরে গিয়ে শোনা যাক। টাকা তো আছে, বিস্তর টাকাই সঙ্গে আছে, কত আর টিকিট কে জানে, যা লাগে দেওয়া যাবে'খন।'

দু-ভাই ভেতরে গিয়ে দু-খানা চেয়ার দখল করে বসেন। কেউ বাধা দিতে আসে না, টিকিট কিনতেও সাধাসাধি করে না কেউ। খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে গান শোনার পর হর্ষবর্ধনের কান ক্ষান্ত হয়, ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর চোখ চলকে ওঠে, দোকানের এদিকে-ওদিকে দিগ্বিদিকে পায়চারি শুরু করে দেন! দাদার কৌতূহলে বিচলিত হয়ে গোবরাও চারিদিকে তাকাতে থাকে, কিন্তু দেখবার মতো তেমন কিছুই তার চোখে পড়ে না।

'ওই যে রে! ওই দেখ! ওই কোণে রে! হর্ষবর্ধন ভায়ের দৃষ্টি সুপরিচালিত করেন ঃ 'যা কিনতে বেরিয়েছি আমরা।'

গোবরা তাকিয়ে দেখে তাইত, চমৎকার পরিপাটি একটি শয়ন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলাতেই যেন কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে।

'বিলিতি চৌকি বোধহয়' কোন কাঠের কে জানে। কেমন রঙ। কী চমৎকার পালিশ দেখেছিস?'

'চৌদ্দপুরুষেও এমন চৌকি দেখেনি।' গোবরার উৎসাহ অদম্য

হয়। উচ্ছ্বাস সে চাপতে পারে না : 'চুয়াত্তর পুরুষেও না, দাদা !'

'একেবারে নতুন ফ্যাশানের ! বিলিতি জিনিস কিনা ? পায়া-টায়া কিছু নেই, চারধার ঢাকা আবার ! দেখতেও খাসা ! তোর বৌদির চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ নয় ! চল্ দাম করা যাক।'

'এই জিনিসটার মূল্য কত ?' দোকানীকে তাঁরা জিগ্যেস করেন।

'আড়াই হাজার।' বলে দোকানী : 'আর আপনার বাড়ি পৌঁছে দেবার কুলি খরচা একশ টাকা। স্পেশাল কুলি লাগবে কিনা এর জন্যে, যাবার ভারি হাঙ্গামা এ-সবের !'

'আড়াই হাজার ! বলেন কি মশাই ?' গোবরা যেন গাছ থেকে পড়েছে : 'একটা চৌকির দাম আড়াই···?' তারপর আর কথা বেরোয়নি তার।

'যাতায়াত খরচাও ত কম না।' হর্ষবর্ধন বলেছেন : 'রাহা খরচ এত ?'

'রাহা-খরচ না রাহাজানি !' টিপ্পনী কেটেছে গোবরা।

হর্ষবর্ধন নিজেকে সামলে নিয়েছেন : 'বিলেতের আমদানি, কি বলেন ? শুধু এই প্রশ্নটুকু করেছেন। তারপর তার অনুমানসঙ্গত জবাব পেয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে গোবরার জ্ঞান সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছেন তিনি : 'তা এমন কি আর ? তেমন কি বেশি ?' দম নিয়ে নবোদ্যমে লেগেছেন, 'আড়াই হাজার বেশি কী এমন ? খাস বিলেতের যে ! লাটেরা শোয় এর ওপর। লাটেরা, সম্রাটেরা সাহেবরা সব শোয়, দামী হবে না ? একটু আক্রাই হবে বৈ কি !'

'ওই ধারের ওই ছোট পিয়ানোটা যদি পছন্দ হয়—' দোকানী পুনরপি জানিয়েছে : 'ওটা তেরশো টাকায় ছাড়তে পারি। মায় মুটে-খরচা, সব।'

'নাঃ, জলচৌকিতে আমার কুলোবে না মশাই ! আড়ে-বহরে শরীরটা তো দেখছেন ? দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কি কম কিছু ?' প্রশস্তভাবে

দুঃখ প্রকাশ করেছেন হর্ষবর্ধন। নিজের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত দুঃখ।

'এই বড়টাই আমার চাই, এই নিন ছাব্বিশ শো! আজই পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু রাত্রের আগেই যেন গিয়ে পড়ে বুঝেছেন?'

ছাব্বিশখানা নোট গুণে দিয়ে, বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তিনি। সহাস্য বদনেই ফেলেছেন।

সেদিন রজনীতে হর্ষবর্ধনের আনন্দ দেখে কে! তাঁর নিজের বিছানা পড়েছে সেই প্রকাণ্ড পিয়ানোটায়, সমস্ত ঘরখানা জুড়েই জিনিসটার আড্ডা জমেছে বলতে গেলে।

হর্ষবর্ধন আরামে গড়াগড়ি দেন তার উপর—'বাঃ, কী চমৎকার কী তোফা, কী তাজ্জব! আমার মতোই লম্বা-চওড়া, বাঃ! আবার কী সব কারুকার্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে! খাস বিলেতের আজব জিনিস...'

চৌকির প্রশস্ততার স্বপক্ষে তাঁর প্রশস্তি ফুরোতে চায় না: 'ভারি সুখ হবে আজ ঘুমিয়ে। সত্যি!'

গোবরা অদূরে সাবেক খাটে ম্রিয়মান হয়ে শুয়ে থাকে। দাদার বিবাহের আসন্ন সম্ভাবনা (অত্য রাত্রে ঘুমের ঘোরে গুঁতোবার জন্যে আর কাকে পাবে!) কিংবা দাদার আনন্দের কলোচ্ছ্বাস কী তাকে বেশি কাতর করে তা বলা যায় না।

হর্ষবর্ধনের পুলক ধরে না। লাটেরা শোয়, সম্রাটেরা শোয়, বড় বড় সাহেব-সুবোয় শুয়ে থাকে যাতে, সেই দেবদুর্লভ চৌকি কিনা তাঁরই পদতলে আজ! তাঁরই দেহভার বহন করেছে সম্প্রতি! সমস্তটাই আগাগোড়া স্বপ্ন বলে তাঁর সন্দেহ হতে থাকে! বকুনি ক্রমাগত বেড়েই চলে: 'কাল সেই পাঁচশ টাকার শালখানা কেচে এসে পড়লেই ব্যস! যেমন দামী আসবাব তেমনি তার দামী ঢাকনা চাই বৈকি? শালদোলাতেই তো মুড়তে হবে একে! তারপর আমায় পায় কে আর! তখন আমিই বা কে আর ছোট লাটই বা কে?'

যতই শোনে গোবরা ততোই আরো মুমূর্ষু হয়ে যায়; ঐ

যৎসামান্য সেকেলে পদার্থটায় শুয়ে নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ বলে ধারণা হতে থাকে তার। মুষড়ে গিয়ে ভারি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে সে।

'গোবরা, সেই পদ্যটা কি রে? সেই যে তুমি মোরে? আহা, সেই যে পাশের বাড়ির ছোঁড়াটা পড়ছিল সেদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে?'

'রবিবাবুর না কার ছড়া নয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবিবাবুর! তা এমন খাটে গড়াগড়ি দিয়ে তোদের ঐ রবিবাবুর মেয়েলী পদ্য কেন, আমাদের মাইকেলের অমন দাঁতভাঙা গদ্যও গড়গড় করে পড়া যায়। আরামের পড়া যায়! এমনি খাটে শুয়েই ত পড়তে হয়, এখনই ত পড়বার সময়! বল না, কী পদ্যটা।' গোবরাকে তিনি পুনঃ পুনঃ তাগাদা লাগান।

'কই স্মরণে আসছে না ত!' সাধু ভাষাতেই সে বলে। মনে করে পদ্য করতে গোবরার ছাই গরজ পড়েছে! ও ত আর কিছু স্বর্গে যায়নি!

'নাঃ, কিছু মনে পড়ে না! তোর মাথাটা বেজায় ফাঁকা, যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় সব। ভারি উজবুক তুই। আহা, সেই যে রে, সেই তুমি মোরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে। তুমি মোরে করেছ সম্রাট!'

কিন্তু এর বেশি আর এক লাইনও তাঁর মনে পড়ে না; অগত্যা, বারবার, প্রায় বাইশবার, সেই একটা লাইন তিনি আবৃত্তি করে যান। অবশেষে আবৃত্তির উপসংহারে, আনন্দের আতিশয্যে পিয়ানোটাকে তিনি প্রণাম করে ফেলেন। দণ্ডবৎ ত হয়েই ছিলেন, কেবল উদ্দেশ্যে মাথাটা ঠেকান—ঠেকান কিংবা ঠোকেন বালিশে তাঁর নিজের সাম্রাজ্যে—তার জন্যে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না তাঁকে।

তারপর আবার সেই এক লাইনের পুনরাবৃত্তির শুরু হয় তাঁর।

গোবরার অসহ্য হয়ে ওঠে! বাড়ছে না কেন ছড়াটা?'

অনুসন্ধিৎসা সে ব্যক্ত করেই ফেলে : কেবল ত তখন থেকেই একটা কথাই আওড়াচ্ছ। আর গৎ নেই নাকি ?'

বাড়ছে না কেন, সেই তো তার দাদারও বক্তব্য। বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য। কিন্তু মনে পড়লে ত বাড়বে? তাঁর বেশ স্মরণে আছে সেই ছেলেটা আরও বেশি বাড়িয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে অনেকখানি বাড়িয়েছিল। তা একেবারে তাঁর হৃদয়গম হয়ে আছে, অন্তরের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে। সে-সব পঙক্তির একমাত্রাও মুখের চৌকাঠের এধারে আনতে পারছেন না হর্ষবর্ধন। অন্দর থেকে বৈঠকখানায় আসতেই চাইছে না তারা। ভারি মুশকিল ব্যাপার।

বহুৎ ভেবে-চিন্তে, রবিবাবুর সাহায্য না নিয়ে, এমন কি কবির তোয়াক্কা না রেখেই, একান্ত নিজের অধ্যবসায়ে, তিনি আরো একটু বাড়ান ! 'শুতে দিয়ে তোমার উপরে তুমি মোরে করেছ সম্রাট !'

'মিলছে না যে !' গোবরার তথাপি অসন্তোষ থেকে যায়, 'মিলছে কই ? পদ্যরা সব মিলে যায় যে, সবাই জানে।

'মিলিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি, দাঁড়া না।'

ভাইকে সবুর করতে বলে নিজেকে কবুল করতে থাকেন তিনি। আবার তাঁর আন্তরিক প্রয়াস আরম্ভ হয়। প্রায় আধঘণ্টা ব্যাপী বহু দুশ্চেষ্টা, বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়ার ফলে রবিবাবুর কি গোবরার কিংবা ও বাড়ির ছেলের কারু নাক-ঢোকানোর অপেক্ষা না করে অন্য কারো বিনা পৃষ্ঠপোষকতায়, সম্পূর্ণ আপনার যোগদানেই, নিজেই তিনি নিজের অভ্যন্তর থেকেই (সেইটাই আরো বেশি আশ্চর্য ঠেকে তাঁর !) আরো একটা গোটা, বেশ মোটাসোটা লাইনকে বাগিয়ে ধরে সবলে বার করে আনেন। এবং আরো বেশি বিস্ময়কর, এবার ওরা গলাগলি মিলে যায়, নিজের থেকেই, ছোড়াদের যেমন বয়াটে দস্তুর চিরকেলে বদভ্যাস।

বাল্মীকির মত গর্বিত হন হর্ষবর্ধন। তাঁর 'মা নিষাদ' উচ্চারিত হয়, 'হে আমার খাট। উঁহু, একটা বিশেষণ দরকার খাটের সঙ্গে,

খাটে খাপ খায়, মানায়, এমন বিশেষণ। হে আমার লাট করা খাট!
শুতে দিয়ে তোমার ওপরে, তুমি মোরে করেছো সম্রাট!'

এরপর গোবরা আর একটি কথাও বলতে পারে না, মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তিনশ বারো বার, একাদিক্রমে সেই তিন লাইনের রক্ত তা শোনাবার পর তার চৈতন্য লোপ পায়। হর্ষবর্ধনও নাজেহাল হয়ে নিজের হাল ছেড়ে দেন, বেহালের মাথায়, ঘুমিয়ে পড়েন শেষে।

হর্ষবর্ধনের বপুর বিপুল চাপ ক্রমশ চৌকি বেচারার কাঠের চামড়া দাবিয়ে, তার হাড়-পাঁজরায় গিয়ে লাগে। মাঝরাতে যেমনি না তিনি পাশ ফিরেছেন অমনি বাজনা শুরু হয়ে গেছে পিয়ানোটার। হর্ষবর্ধনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, চমকে উঠে বসেছেন তিনি, একি! ভৌতিক কাণ্ড নাকি? নানাবিধ সুমিষ্ট আওয়াজ আসছে চৌকির ভেতর থেকেই! আশ্চর্য!

ডাকাডাকি করে তিনি গোবরার ঘুম ভাঙিয়েছেন: আরে, আরে, এই গোবরা! চৌকিটা বাজে যে রে। চৌকিটা বাজে?'

ভয়ানক হাঁকডাক চালিয়েছেন, গোবরার শক্ত ঘুম কি সহজে ভাঙে! কিন্তু ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঝনৎকার বেরিয়ে আসে, 'বাজেই ত হবে! অত দামী জিনিস কখনো বাজে না হয়ে যায় নাকি?'

'আরে সে বাজে নয় বাজছে যে। বাজনা লাগিয়েছে চৌকিটা। আপনা থেকেই! আশ্চর্য!' হর্ষবর্ধনের বাক্য বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে।

এবার গোবর্ধন ধড়মড়িয়ে বসে, 'তাই নাকি? অ্যাঁ? তাইত!'

দাদার লম্ফঝম্ফ এবং চৌকিদার জগঝম্প সমান তালে চলেছে!

হর্ষবর্ধন উৎসাহের বশে, বিছানায় ইতস্ততঃ হাত-পা ছুঁড়তে

থাকেন আর এক-এক রকমের চমৎকার আওয়াজ বেরিয়ে আসে। বক্তব্য আর ফুরোয় না!

'দেখছিস এর আগাপাশতলাই রাগ-রাগিণী! একি ব্যাপার?' হর্ষবর্ধন হাঁ করে থাকেন।

'ভারি উপদ্রব বাধালে তো!' সবরকম শুনেটুনে, গোবরা পরিশেষে বিরক্তি প্রকাশ করে: 'ঘুমের দফা রফা। এ আর ঘুমোতে দেবে না কোনদিন!' তার বদনমণ্ডলে বিকারের চিহ্ন দেখা যায়: 'যতদিন বেঁচে থাকবে জ্বালিয়ে মারবে।'

'বাবাঃ, কে জানত বিলেতের লোকেরা চৌকিতে বসে গান শোনে। এমন জানলে কিনত কে? তা, তোর বৌদি পেলে খুশি হবে খুব।' স্বর্গই পাবে হাতে। এত চৌকি না; রোশনচৌকি!

সমস্ত খতিয়ে সবকিছু বিবেচনা করে অচিরেই তিনি আনন্দিত হয়ে ওঠেন, 'না, এতে আর শোয়া নয়, শাল মুড়ে রেখে দিতে হবে কালকে। পরে একদিন সুবিধে মতো বাতি পাঠিয়ে দেব, রেলগাড়ি চাপিয়ে তোর বৌদির জন্যে। সে গান-বাজনা ভারি ভালবাসে। তার সঙ্গেই ঠিক খাপ খাবে, ভাব জমবে, পোষাবে এর। শোয়াকে শোয়া, গানকে গান! হাঃ হাঃ! দুটোই বেশ হরদম চলবে। হ্যাঁ।

তারপর সসম্ভ্রমে রোশনচৌকি ছেড়ে দিয়ে গোবরার খট্টাঙ্গে নিজেকে চালান করেন তিনি।

দাদাকে পুনর্মুষিক হতে দেখে গোবরা পুনরায় খুশি হয়। এমন কি এজন্যে সে অনেকখানি কষ্ট করে ফেলে, দাদাকে আশ্বাস দিয়ে, তক্ষুনি উঠে, এ ঘরে ও-ঘরে দৌড়ে গিয়ে, সমস্ত বিছানার যাবতীয় বালিশটার যোগাড় করে আনে, তার সঙ্গে নিজের বালিশটারও ত্যাগ স্বীকার করে। সবগুলো জোট পাকিয়ে দলবদ্ধ করে তার আর দাদার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক পাহাড় বানায় সে।

'এই তো বেশ বারান্দা করে দিলাম, আর ভয় নেই দাদা! প্রাচীর

ভেদ করে আমার হাত-পা চলবে না ত, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে তক্ষুনি।' গোবর্ধন অগ্রজকে উৎসাহ দিতে চায়ঃ 'এবার তুমি অকাতরে ঘুমুতে পার দাদা—আর ভাবনা কি?'

হর্ষবর্ধন পর্বতের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেন। সভয়েই নেন, কেননা সেখানের নিদ্রার খুব বেশি ভরসা তাঁর ছিল না। ঘুসি চালিয়ে পাহাড়ে ধস নামাতে গোবরার কতক্ষণ! গান শুনতে শুনতে ঘুম দেয়া শক্ত খুব সত্যিই, কিন্তু প্রাণ হাতে করে ঘুমনোও কি খুব সহজ ব্যাপার? হর্ষবর্ধন হর্ষিত হতে পারেন না।

———

● ● ● ● ● ● ● ●

গোঁফের জ্বালায় হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন ষ্টিমার পার্টি দিয়েছিলেন।

তিনি, তাঁর ভাই শ্রীমান গোবর্ধনচন্দর, তস্য বৌদি শ্রীমতী হর্ষবর্ধন সেই সঙ্গে আমি, আমার বোন ইতু, ইতুর কাজিন-রত্নরা, তাদের বন্ধু আর বন্ধুনীরা সহযাত্রী।

একটা মাঝারি সাইজের ষ্টীম-লঞ্চ ভাড়া করে গঙ্গাসাগরের মোহনা অবধি পাড়ি দেবার মতলব ছিল আমাদের।

'নাঃ, কিছুই হলো না এ জীবনে···'

লঞ্চে উঠেই প্রথম ষ্টীম বার করলেন হর্ষবর্ধন ফোঁস করে হঠাৎ।

মোহনায় পৌঁছনোর আগেই তাঁর এই মোহভঙ্গ আমায় অবাক করে দেয়।

'কেন, এই যে ষ্টীমার-পার্টি হলো এমন। কতদিনের সাধ ছিল আমাদের! আপসোস মিটল,' গোবর্ধন কয়।

'আমার জীবনে তো এই প্রথম! ষ্টীম লঞ্চে চাপলাম।' আমি জানাই। 'এর আগে অবিশ্যি ষ্টীমারে, ইয়াব্-বড়ো ষ্টীমারে চেপেছি সেই সেকালে পদ্মা পাড়ি দেবার কালে। কিন্তু ষ্টীম-লঞ্চে ষ্টীমার পার্টি এই প্রথম ভাই।'

'আমি বজরায় চেপেছিলাম একবার। আমাদের কথার মাঝখানে শ্রীমতী ইতুর বজ্রাঘাত।

'অনেক কিছুই পাওয়া হয়নি-এ জীবনে এখনো।' তিনি কন—'বিস্তর পাওনা বাকি।'

'জানি। টাকা ধার দিলে ফেরত পাওয়া যায় না। মার খায় টাকাটা' আমি নিজের প্রতিই যেন বাঁকাচোখে তাকাই--'কিন্তু যার

নাকি অঢেল টাকা তো আপনার কাছে ঢেলার মতই, এবং আমার কাছেও সেটা পরের টাকা হয়। পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ—বলে গেছেন না চাণক্য ঋষি? আপনি কি ধার দিয়ে পাবার আশা রাখেন আবার? ফেরত পেতে চান আপনার টাকা?'

'চান যদি তো বন্ধুর সঙ্গে ঐক্যটা যাবে' ইতু জানায়—'এবং এটাও পাবেন না, চাণক্য এ-কথা না বললেও। এখন ঐক্য চান না টাকা? সেই কথা বলুন।'

'সে কথাই নয়, টাকায় কী হয়? জীবনের সব কিছু কি পাওয়া যায় টাকায়। টাকা দিয়ে কী নাম-টাম হয়?'

টাকা দিয়ে?' দাদার জিজ্ঞাসার জবাব তার ভাই দিয়ে দেয়, হ্যাঁ, টাকা দিয়ে বদনাম হতে পারে সেই টাকা ফিরে চাইলে পরে। আর সেটা কি এক রকমের নাম হওয়া নয় কি?

'দূর্-দূর্। সে-সব নাম নয়। খবরের কাগজে নাম বেরোয় তাতে?'

'খবরের কাগজে নাম করতে হলে খবর হতে হয় আগে।' আমার বক্তব্য।

'খবর, না খাবার? কাকে খাওয়াতে হবে? সম্পাদককে, না তোমায়?' ইতুর জিজ্ঞাসা।

'খাবার নয়, খবর।' আমি জানাই, 'যিনিই খবর হবেন তাঁর নামই কাগজে বেরুবে এমনিতেই তিনি না চাই'লেও।

'কী করে খবর হওয়া যায়?'

'মনে করুন, কুকুর যদি আপনাকে কামড়ায় সেটা কোন খবরই নয়, কিন্তু আপনি যদি কোন কুকুরকে কামড়ান তবেই এমনটা খবর হয়। বিখ্যাত পুরনো বয়েৎটা আমি পুনশ্চ আওড়াই।

'কুকুর আমি এখন পাই কোথায়? কুকুর তো আনা হয়নি স্টীমারটায়।'

'আনা হয়েছে, এসেওছে।' ইতু জানায়, কুকুর বাঁদর ভালুক সবাই এসেছে ওপর ওপর দেখে ঠাওর পাওয়া যাচ্ছে না। তারা

সবাই ছদ্মবেশে আছে। ভোল পালটে রয়েছে কিনা এর ভেতরে। কি করে টের পাবে?'

ভালুক বলে সে আমার প্রতিই কটাক্ষ করে কিনা কে জানে!

'দেখুন আবার, কুকুর বলে ভুল করে যেন ঠাকুরকে কামড়ে বসবেন না—হাজার লোভনীয় হলেও।' আগে-ভাগেই আমার সাবধান করে দেওয়া, ইতু একটা ঠাকুর জানেন তো? ইতু পূজো হয়ে থাকে এদেশে।'

আমিই তো করি ইতু পূজো। হর্ষবর্ধনের শ্রীমতী প্রকাশ পান, 'তবে আপনার ইতুকে নয়। কুমোরটুলির থেকে ইতু ঠাকুর গড়িয়ে আনি। বামুন ভোজে আপনাকে ডাকা হয়, মনে নেই।

কুকুরও নেই, কিচ্ছু নেই, তবে আর আমি খবর হবো কি করে? হর্ষবর্ধনের হা-হুতাস।

'না থাকলে তো কী! ইতুই একটা সমাধান বাতলায়, ধরুন, কেউ যদি এখন ষ্টিমারটা থেকে পড়ে যায়—যেতে পারে না? আকস্মিক দুর্ঘটনা তো অকস্মাৎ ঘটে থাকে। আর অপনি যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করেন তবে তৎক্ষণাৎ আপনি একটা খবর হয়ে উঠবেন। আপনার নাম বেরোবে কাগজে।

'হ্যাঁ তাহলে হয় বটে।' আমি সায় দিই ওর কথায়, কে এখন নিজেকে জলাঞ্জলি দিতে যাবে? কার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে সাধ করে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে? কেউ যদি নিজগুণে জলে পড়ে তবেই না উনি নিজরূপে প্রকট হতে পারেন। অবশ্যি ফিনফিনে সিল্কের শাড়িপরা কোন মেয়ে পড়লে তিনি গুণপনার সংগে নিজের রূপযৌবনও প্রকাশ করতে পারবেন।' বলে আড়চোখে আমি শ্রীমতী হর্ষবর্ধনের দিকে তাকাই।

'উনি আমার জীবনটা তো জলেই ভাসিয়ে দিয়েছেন, আবার আমি ওর জন্যে সাধ করে জলে ভাসতে যাব? গলায় দড়ি আমার!' শ্রীমতীর তীব্র কটাক্ষ হর্ষবর্ধন এবং আমার প্রতি যুগপৎ।

'আর আমিও ওনাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপাতে যাচ্ছিনে—আমার দায় পড়েছে! উনি যতো খুশি ভেসে যান না!'

'তা জলে ঝাঁপিয়ে কাউকে বাঁচাবেন যে, সাঁতার জানেন আপনি?' জল ঘোলা হবার আগেই আমি অন্য কথা পাড়ি।

'মোটামুটি জানা আছে এক রকম।'

'মোটামুটি?'

'হ্যাঁ, মোটা লোকরা ফুটবলের মতন সহজে ডোবে না, ভাসতে থাকে জলের ওপর। ডুববো না যে কিছুতেই, এটা আমি বেশ জানি।'

'ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাশীর গংগায় ভাসতেন, দেখেছি ছবিতে।' গোবর্ধন দাদার কথায় সায় দিতে গিয়ে ভাসমান একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এনে ফেলে।

'সেটা উনি 'মোটা' বলে নয়, যোগবলে।' আমি ব্যক্ত করি।

'ত্রৈলঙ্গ' স্বামীর আসল নাম ছিল নাকি শিবরাম। জানো দাদা?'

'আমি কিন্তু জলে পড়লে মার্বেলের মতই ডুবে যাব- হাজার মোটা হলেও। আর ঐ শিবরাম হলেও।' গোবরার ফ্যাকরা থেকে আমি নিজেকে কাটিয়ে আনি, 'পরের ঘাড় ভেঙে ভাল-মন্দ চর্বিত-চর্বণের ফলেই আমার এই চর্বিযোগ। এ-যোগ সে-যোগ নয়?'

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই—আমার কথাটায় না—হঠাৎ ইতুর অধঃপতনে। কে জানে কি করে নিজের কিংবা রেলিংয়ের হাত ফসকে জলে পড়ে গেছে সে ফস্ করে!

কে এখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করে? খবরের কাগজে নাম বার করার কারোরই তেমন উৎসাহ দেখা গেল না—এমন কি হর্ষবর্ধনেরও নয়।

হর্ষবর্ধন উল্‌টে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল এটা যেন আমারই এক দায়।

তাঁর চাউনিটা আমি গায়ে মাখি না। বরং তাঁকেই বলি, 'এই তো সুবর্ণ সুযোগ আপনি হাতছাড়া করবেন না।'

'হ্যাঁ, সুবর্ণ সুযোগ বটে কিন্তু আমার নয়, যে মেয়েটাকে জল থেকে তুলবে তাকে আমি হাজার টাকা পুরস্কার দেব···' তিনি ঘোষণা করেন—'হাজার, দু'হাজার, পাঁচ-হাজার···' তিনি বলে যান।

কিন্তু লঞ্চ-ভরতি সোনার চাঁদদের শোনানোই সার, কাউকেই জলে নামানো যায় না। খাঁটি সোনা কেউ নয় বলেই বোধহয় সবার মুখেই কেমন একটা গিলটি গিলটি ছাপ। সবাই চুপচাপ।

পাঁচ-হাজার···ছ-হাজার···সাত···

বলতে না বলতেই ঝপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি।

ইতু ভাল সাঁতার জানে, সে অবলীলায় জল কাটছিল। আর হর্ষবর্ধনও, পড়েও কিন্তু ডুবলেন না -ফুটবলের মতই ভেসে রইলেন—যা বলেছিলেন তাই।

হর্ষবর্ধনকে ঘিরে তাঁর চারপাশে সাঁতার কাটতে লাগল ইতু। ঘুরে-ফিরে—নানান ভঙ্গিমায়।

খানিক বাদেই দেখা গেল ইতুকে ল্যাজে বেঁধে তিনি ফিরে এসেছেন, এসে ভিড়েছেন লঞ্চের কিনারায়।

সঙ্গে সঙ্গে দড়ির মই ফেলে দু'জনকেই হৈ-হৈ করে টেনে তোলা হলো।

ক্যামেরা ছিল কয়েকজনের, চটপট ছবি তুলল তারা।

আপনার সচিত্র ছবি ছাপা হবে এবার। বার হবে তা খবর-কাগজেই। উৎসাহিত হয়ে আমি ওঁকে অভিনন্দন জানাই।

যে নাম তুমি নাকি চাইছিলে দাদা, হলো তো এবার? আর কী চাও?'

'কে চাইছে নাম? কে চেয়েছে? উঃ! এমন গোঁফ ব্যথা করছে না আমার!' গোঁফের উপর তিনি হাত বুলোতে থাকেন।

ঝপাৎ করে জলে পড়লে গায়ে লাগতে পারে হয়তো···' ওঁর

কথায় আমি অবাক হই—'কিন্তু গোঁফে লাগবার তো কথা নয় !

গোঁফটা এমন টাটিয়েছে না আমার' রোষভরে তিনি সমুৎসাহিত সবার দিকে তাকান, তার পরে কন—'কে আমায় জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল শুনি ? উফ্ ! কেন যে গোঁফ আমার এমন টাটিয়ে উঠল হঠাৎ। একবার যদি তাকে ধরতে পারি না—দেখে নেব একবার !' বলে সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে আমার ওপরেই তাঁর দৃষ্টি দিয়ে রাখেন···দেখতে থাকেন।

'ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে আপনাকে ? সে কী !···

তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এড়াতে আমি বলি—'আমি তো দেখলাম আপনি নিজেই শখ করে জলে ঝাঁপ দিলেন !'

'শখ করে ? শখের প্রাণ গড়ের মাঠ ! মাইরি আর কি !'

'এখানে গড়ের মাঠ নয় দাদা, গঙ্গাঘাট।' দাদার ভ্রম-সংশোধন করে ভ্রাতায়—শখের প্রাণ গঙ্গাঘাট।'

তুই থাম্। আমার প্রাণ যাচ্ছে এদিকে। গোঁফের জ্বালায় গেলাম। কেন যে লোকে সাধ করে বড়ো বড়ো গোঁফ রাখে।' হর্ষবর্ধনের প্রাণের আর গোঁফের জ্বালা একসঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে।

'ইস্। এমন জ্বলছে গোঁফ যে কী বলবো।'

কোন্ গোঁফটা ? জিগ্যেস করে ইতু চন্দ।

দুটো গোঁফই। দু ধারের গোঁফই। কেন জ্বলছে কে জানে। জলে পড়লে গোঁফ জ্বলে—আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম।'

'আমারও। যদিও আমার গোঁফ নেই আর কখনো জলেও পড়েনি। ইতু, এদিকে আয় তো।' বলে ইতুকে আমি সরিয়ে আনি। হর্ষবর্ধনের ক্রুদ্ধদৃষ্টির আওতা থেকে সরে লঞ্চটার অন্যধারে চলে যাই।

'হ্যাঁরে, তুই ওঁকে জলে ফেলে দিসনি তো ?' শুধাই ইতুকে।

'বা রে ! আমি কী করে ফেলবো ? ফেলতে যাব কেমন করে

শুনি? আমি ওঁর আগে জলে পড়লুম না।

'তাও তো বটে!' কথাটা মানতে হয় আমায়।

সে বলে: 'কষ্টে-সৃষ্টে ওই কনকনে জলে আমি নিজেকেই ফেলতে পেরেছি কেবল। লঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে কী দশা হয়েছে আমার দ্যাখো। ফ্রক-টক সব ভিজে একশা—একাকার।' নিজের লাঞ্ছনা দেখায় ইতু।

'এখন চট করে ফ্রগ-ট্রকগুলো বদলে ফ্যাল তো। ভিজে পোশাকে থাকলে অসুখ করবে না।'

'আমি কি বাড়তি পোশাক-টোশাক এনেছি? জলে পড়তে হবে কি জানতাম?'

'তবে? তাহলে? এক কাজ কর।' আমি ওকে স্টিমারের অন্য ধারে টেনে নিয়ে যাই—'আমার গেঞ্জিটাকে আণ্ডারওয়ারের মতো পরে জামাটাকে গায়ে চড়াও—আপাততর মতন একটা ফ্রক হোক। এই-ফ্রক-শার্ট যেমন কিনা ফ্রককোট হয় না ছেলেদের?'

আর তুমি?

'আমি খালি গায় একটু গঙ্গার খোলা হাওয়া খাই। গা জুড়াই। যাক, হর্ষবর্ধন যে তোকে উদ্ধার করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।'

'উনি উদ্ধার করেছেন? আমায়? না আমি উদ্ধার করলুম ওনাকে?' ইতু প্রকাশ করে—'সাঁতারই জানেন না উনি। আমিই তো ওঁকে জলে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে এলাম।'

'তুই? কি করে আনলি রে তুই—ওই লাশটাকে?'

'কি করে আবার? ওঁর গোঁফ ধরে। হাতের কাছে ধরবার কিছু পেলাম না তো আর। ভাগ্যিস্ ওনার অমন ডাগর গোঁফ ছিল তাই রক্ষে।'

———

● ● ● ● ● ● ●

হর্ষবর্ধনের অক্কালাভ

অবশেষে সেই দিনটি এল। শেষের সেই শোকাবহ দিনটি ঘনিয়ে এল হর্ষবর্ধনের জীবনেও—

আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ যেন তিনি ধুঁকতে লাগলেন। বললেন, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। কী কেন করছে। বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন সটান।

বুঝতে আর বাকি রইল না। রোজ সকালের দৈনিক খুলেই যে-খবরটা সর্বপ্রথম নজরে পড়ে—তেমন খবর একটা না একটা থাকেই রোজ—কালকের কাগজ খুলেও আরেকটা সেইরকমের দুঃসংবাদ দেখতে পাব টের পেলাম বেশ।

যে-খবরে আত্মীয়বিয়োগ নয়, আত্মবিয়োগের ব্যথা অনুভব করে থাকি—আমারো তো উচ্চ রক্তচাপজনিত হার্টের দোষ ঐ—রোজই যে খবর পড়ে আমার বুক ধড়ফড় করে আর মনে হয় আমিই যেন মারা গেলাম আজ, আর আধঘণ্টা ধরে প্রায় আধমড়ার মতই পড়ে থাকি বিছানায়—মনে হলো তেমন ধারার একটা খবর যেন আমার চোখের ওপর ঘটতে চলেছে এখন।

ক'দিন ধরেই ভদ্রলোকের শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল না, বুকের বাঁ দিকটায় কেমন একটা ব্যথা বোধ করছিলেন—দেখাই দেখাই করে, কাজের চাপে পড়ে সময়াভাবে আর ডাক্তার দেখানো হয়ে উঠছিল না তাঁর···অবশেষে তিনি ডাক্তারের দেখাশোনার একেবারেই বার হতে চলেছেন···মারাত্মক সেই করোনারি থ্রম্বোসিস্ এসে তাঁর হৃদয়ের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়েছে এখন।

তাহলেও ডাক্তার ডাকতে হয়।

ছুটলাম ট্যাক্সি নিয়ে রাম ডাক্তারের কাছে। এই এলাকায়

ডাক্তার বলতে গেলে তিনিই একমাত্র।

গিয়ে ব্যাপারটা বলতেই রাম ডাক্তার গুম হয়ে গেলেন। কিছু না বলে ঢুম করে তাঁর বিখ্যাত ডাক্তারি ব্যাগের ভেতর থেকে একটা অ্যামপিউল বার করে নিজের ইনজেকশনের সিরিঞ্জে ভরলেন।

ভয় খেয়ে আমি বলি—'আজ্ঞে না, আমি নই। আমার কিছু হয়নি। কোনো অসুখ করেনি আমার। দোহাই আমাকে যেন ইনজেকশন দেবেন না। হর্ষবর্ধনবাবুর বুকেই ··বলতে বলতে আমি সাত হাত পিছিয়ে গেলাম ভয় খেয়ে। রাম ডাক্তারের ঐ এক ব্যারাম, অসুখের নাম করে কেউ সামনে এলে, কাছে পেলেই, ধরে তাকে এই ইনজেকশন ঠুকে দেন।

তিনি আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সিরিঞ্জ হাতে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ট্যাকসিতে গিয়ে উঠলেন। সিরিঞ্জ হাতে নামলেন ট্যাকসির থেকে আমার হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ গছিয়ে দিয়ে।

গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন বিছানায় লম্বমান। দেখেই বুঝলাম হয়ে গেছে! দেহরক্ষা করেছেন ভদ্রলোক।

সিরিঞ্জটা আমার হাতে দিয়ে—'ধরুন, এটা ততক্ষণ' বলে রাম ডাক্তার হর্ষবর্ধনের নাড়ি টিপে দেখলেন। তারপর স্টেথিসকোপ বসালেন। অবশেষে গম্ভীর মুখে জানালেন—সব শেষ।

আমি 'ফল ধররে লক্ষ্মণের' মতন তাঁর সিরিঞ্জ হাতে কম্পাউণ্ডারের ঢুলক্ষণের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি তখনো।

'দিন ত সিরিঞ্জটা—' আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—ওষুধটা আর নষ্ট করব না। ওঁর নাম করে সিরিঞ্জে যখন ভরেছি তখন ইনজেকশনটা বরবাদ না করে দিয়েই যাই বরং ওনাকে।'

বলে মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা মারার মতই ইনজেকশনটা স্বর্গত তাঁর বুকের ওপর ঠুকে দিয়ে ভিজিটের টাকাগুলো গুনে নিয়ে ব্যাগ হাতে ট্যাকসিতে চাপলেন আবার।

হর্ষবর্ধনের বৌ পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন। আমি একখানা সাদা

চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম শবদেহকে।

গোবর্ধন চোখের জল মুছে বলল—'কান্না পরে। ভায়ের কাজ করি আগে। আমি নিউ মার্কেটে চললাম, ফুল নিয়ে আসি গে। তারপর খাট সাজাতে হবে। আপনি যদি পারেন তো ইতিমধ্যে কীর্তনীয়াদের ডেকে নিয়ে আসুন—বন্ধুর 'কর্তব্য করুন।'

'তার আগে চাই ডেথ সার্টিফিকেট।' আমি জানাই: 'তা না হলে ত মড়া নিয়ে কেওড়াতলায় ঘেঁষতেই দেবে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে ডাক্তারবাবু চলে গেছেন ভুলে···ডেথ সার্টিফিকেটটা না দিয়েই—সেটা লিখিয়ে আনিগে তাঁর কাছ থেকে। তার পরে ফেরার পথে তোমার সংকীর্তন পার্টির খবর নেব না হয়।'

ডেথ সার্টিফিকেট পেলাম কিন্তু কেত্তুনেদের খোঁজ পাওয়া গেল না। তারা কোথায় থাকে, কোথায় যায় কেউ তা বলতে পারল না। শুধু এইটুকু জানা গেল যে আজকাল নাকি তাদের ঘোর চাহিদা! ঘৃত দুগ্ধপুষ্ট মনস্বী যতো বড় লোকদের মড়ক যেন লেগেই আছে চারধারে এখন।

ডেথ সার্টিফিকেট হাতে দরজাতে পা ঠেকাতেই চমকে উঠতে হলো। বাড়িতে পা দিতেই যাঁর ক্রন্দন ধ্বনি কানে আসছিল তিনি আর্তনাদ করে উঠছেন যে অকস্মাৎ!

ঢুকে দেখলাম, হর্ষবর্ধনের স্ত্রীও নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ সটান!

'সতীসাধ্বী সহমরণে গেলেন!' বলে তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে নাকের গোড়ায় হাতটা ঠেকাতেই—ওমা। নিশ্বাস পড়ছে যে বেশ! অজ্ঞান হয়ে গেছেন মাত্র।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই নড়েচড়ে উঠে বসলেন উনি!

'হঠাৎ অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যে! হয়েছিল কী?' আমি জিজ্ঞেস করি।

তিনি ভীত বিহ্বল নেত্রে বিগত হর্ষবর্ধনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—'নড়ছিল যেন মনে হলো।' বলে নিজের আশঙ্কাটা

ব্যক্ত না করে পারলেন না—'শনিবারের বারবেলায় গত হলেন, দানোয় পায়নি ত? ভূতপ্রেত কিছু হননি ত উনি?'

'প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা শুধোচ্ছেন? তা কি করে হয়? ওঁর মতন দানব্রত পুণ্যাত্মা লোক সটান স্বর্গে চলে গেছেন। উনি ত হবেন না—না কোনো ভূত ওঁর দেহে ভর করতে পারবে।' বলে মুখে সাহস দিই বটে কিন্তু সত্যি বলতে আমার বুক কেঁপে ওঠে 'রাম নাম করুন, তাহলেই আর কোন ভয় নেইকো।'

'আমার শ্বশুর ঠাকুরের নাম যে, করি কি করে?' তিনি বলেন—'আপনি করুন বরঞ্চ।

'আমাকে আর করতে হবে না রাম নাম। আমার নামের মধ্যেই স্বয়ং রাম আছেন, তার ওপর আমার হাতে সাক্ষাৎ রাম ডাক্তারের সার্টিফিকেট—এই দেখুন—ভূত আমার কাছে ঘেঁষবে না।'

দেখতে দেখতে হর্ষবর্ধন নড়ে চড়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। খানিকক্ষণ যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন চারদিকে। তারপর নিজেকে চিমটি কেটে দেখলেন বারকয়েক—'নাঃ, বেঁচেই আছি বটে।' বলে তারপর শুধোলেন আমাদের 'শিবরাম বাবু। আপনি অমন গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে কিসের জন্যে? গিন্নি, তোমার চোখে জল কেন গো?'

কারো কোন বাক্যস্ফূর্তি না দেখে আপন মনেই যেন শুধালেন আবার—'কী হয়েছিল আমার?'

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত মনে করে আমি তাঁকে পালটা জিজ্ঞেস করলাম—'আপনিই ত বলবেন আপনার কী হয়েছিল।'

'কিছুই হয়নি। তিনি জানালেন তখন—'একটা ভারী বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম যেন। এই রকমটাই হচ্ছে এখন।'

'কিছুই হয়নি তাহলে। আপনি কিছু আর ভাববেন না। কর্তাকে গরম গরম এক কাপ কফি করে দিন তো।' বললাম আমি শ্রীমতীকে।

উনি দু কাপ কফি করে নিয়ে এলেন—আমার জন্যও এক কাপ ঐ সঙ্গে।

কফির পেয়ালা নিঃশেষ করে তিনি বললেন—'আপনার হাতের কাগজটা কী দেখি তো।'

কাগজখানা হস্তগত করে নাড়াচাড়া করলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—'ডাক্তারদের প্রেসক্রুপশনের মাথামুণ্ডু কিছু যদি বোঝা যায়! কম্পাউণ্ডাররাই বুঝতে পারে কেবল।'

ইতিমধ্যে গোবরা কয়েক তোড়া ফুল নিয়ে এসে হাজির।

'এত ফুল কিসের জন্যে রে? ব্যাপার কি আজ?' অবাক হয়ে শুধিয়েছেন তিনি।

'আজ যে আপনাদের বিয়ের তারিখ তা একদম মনে নেই আপনার? সে কারণে আমার কথায় গোবর্ধন ভায়া ফুল কিনে আনতে গিয়েছিল বাজারে। নতুন ফুলশয্যার দিন না আজ আপনার?'

'বিয়ের তারিখ বুঝি আজ? তাই নাকি? একেবারেই মনে ছিল না আমার।' বলে আপন মনেই যেন তিনি গজরান—'মনেও থাকে না তারিখটা। রাখতেও চাইনে মনে করে। বিয়ের তারিখ তো নয়, আমার ইয়েব তারিখ—অপমৃত্যুর দিন আমার।'

আমি একবার বক্রকটাক্ষে শ্রীমতী হর্ষবর্ধিনীর দিকে তাকাই। তিনি কিছু বলেন না। তাঁর ভারিক্কি মুখ যেন আরো ভারী হয়ে উঠছে দেখা যায়।

হর্ষবর্ধন রাম ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা গোবরার হাতে দিয়ে বললেন—'যা তো গোবরা। রাম ডাক্তারের এই প্রেসক্রুপশনটা নিয়ে সামনের ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডার বাবুকে দে গিয়ে—যেন ওষুধটা চট্‌পট্‌ বানিয়ে দেন দয়া করে।

গোবর্ধন বেরিয়ে গেলে আমার দিকে ফিরলেন তিনি—'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম মশাই—বলব স্বপ্নটা। আপনাকে

একসময়। আপনি গল্প লিখতে পারবেন তার থেকে। কিন্তু স্বপ্ন দেখে আমি তেমন অবাক হইনি মশাই, স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি, ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখতে হয়। কিন্তু এই অবেলায় হঠাৎ এমন ঘুমিয়ে পড়লাম কেন, এমন তো ঘুমোই না, তাই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি আরো!'

'ঘুমের আবার বেলা অবেলা আছে নাকি?' ঘুমের তরফে সাফাই গাইতে হয় আমায়—'সব সময়ই হচ্ছে ঘুমের সময়। তার ওপর রাতের বেলা ত বটেই। যখন ই'চ্ছে ঘুমোন। আমি তো সময় পেলেই একটুখানি ঘুমিয়ে নিই মশাই। অসময়ে ঘুমোই আবার, ঘুমোতে তো আর ট্যাকসো লাগে না—'

বলতে বলতে গোবর্ধন একটা শিশি হাতে ফিরে এল—'এই মিকচারটা বানিয়ে দিল কম্পাউণ্ডার। তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাবে। এক দাগ খেয়ে ফ্যালো চট করে এক্ষুনি।'

হর্ষবর্ধন এক দাগ গিলে যেন একটু চাংগা বোধ করলেন—'বাঃ বেড়ে ওষুধ দিয়েছে তো। খেতে না খেতেই বেশ সুস্থ বোধ করছি। থাক প্রেসকৃপশনটা আমার কাছে।' বলে গোবর্ধনের হাত থেকে সেই ডেথ-সার্টিফিকেটখানা নিয়ে নিজের বালিশের তলায় গুঁজে রাখলেন তিনি—মনে হচ্ছে ওটা খেয়ে যেন নবজীবন লাভ করলাম। চালিয়ে যেতে হবে ওষুধটা। রাম ডাক্তারেব দাবাই বাবা। ডাকলে সাড়া দেয়।'

'আপনার এয়োতির জোরেই বেঁচে গেছেন উনি এ যাত্রা!' কানে কানে ফিসফিস করে এই কথা বলে ওঁর বৌয়ের হাসিমুখ দেখে আর ওকে বহাল তবিয়তে রেখে ওঁদের বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম সেদিন।

দিন কয়েক বাদে হর্ষবর্ধন রাম ডাক্তারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক পশলা বৃষ্টি আসতেই তিনি বাড়ির দোর গোড়াটায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

তারপর সেখানেও বৃষ্টির ছাট আসছে দেখে ভাবলেন, রাম ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে এমন ভালো আছেন, তাঁর সংগে একবার দেখা করে ধন্যবাদটা জানিয়ে যাই।

ভেবে যেই না তাঁর চেম্বারের ঢোকা রাম ডাক্তার তো আঁ আঁ করে আঁতকে উঠেছেন তাঁকে দেখেই না।

'ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু। চিনতে পারছেন না আমায়? আমি শ্রীহর্ষবর্ধন।' তাড়াতাড়ি তিনি বলেন—'আপনার ওষুধ খেয়ে আমি ঢের ভালো আছি এখন। বুকের সেই ব্যাথাটাও নেই আর। সেই কথাটাই বলতে এলাম আপনাকে।'

আমি তো কোনো ওষুধ দিয়ে আসিনি আপনাকে। শুধু একটা কোরামিন ইনজেকশন দিয়েছিলাম কেবল তবে···কি, তারই রি-অ্যাকশনের আপনি পুনর্জীবন···

'সে কি! আমাকে দেখে এই প্রেসক্রুপশনটা দিয়ে আসেননি আপনি?' বাধা দিয়ে বললেন হর্ষবর্ধনঃ কাগজখানা সেই থেকে আমি বুকে করে রেখেছি যে। কখনো কাছ ছাড়া করিনে। আপনার এই প্রেসক্রুপশনের ওষুধ খেয়েই ত আমি নবজীবন লাভ করলাম মশাই।'

কাগজখানা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রাম ডাক্তারের দিকে।

'প্রেসক্রুপশন? দেখি—অ্যাঁ—এটা তো আপনার ডেথ সার্টিফিকেট —আমিই দিয়েছিলাম বটে।'

'ডেথ সার্টিফিকেট? অ্যাঁ?' এবার আঁতকাবার পালা হর্ষবর্ধনের। কাঁপতে কাঁপতে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি।

'আমার ডেথ সার্টিফিকেট? তাই-ই বটে।' খানিকটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন তারপর—'তাহলে ঠিকই হয়েছে। আমার সেই ভীষণ স্বপ্নটার মানে আমি বুঝতে পারছি এখন···এতক্ষণে বুঝলাম '

'আপনি কি তাহলে মারা যাননি না কি?'

'তাহলে কি এখন ভুত হয়ে···' ভয় খেলেও তেমন ভয়াবহ কিছু

নয় বিবেচনা করে ডাক্তার তত ঘাবড়ালেন না। এবার—'দেখুন স্বর্গীয় হর্ষবর্ধনবাবু। আমার কোন দোষ নেই। আমি আপনাকে মারিনি। সে সুযোগ আমি পাইনি বলতে গেলে আমি গিয়ে পৌঁছবার আগেই আপনি খতম হয়েছিলেন··· ।'

'না না, আপনার কোনো দোষ দিচ্ছিনে। আমি মারা গেছলাম ঠিকই। আমার নিজগুণেই মরেছিলাম। আপনার ডেথ সার্টিফিকেটেও কোনো ভুল হয়নিকো। যমালয়েও নিয়ে গেছল আমায়। ঘটনাটা যা হয়েছিল বলি তাহলে আপনাকে। যমালয়ে ফেরতা বেঁচে ফিরে এলাম কি করে আবার—শুনলে আপনি অবাক হবেন।'

সন্দেহ একেবারে না গেলেও রাম ডাক্তার উৎকর্ণ হন।

'যমদূতেরা নিয়ে গিয়ে যমরাজার দরবারে তো হাজির করল আমায়।' বলে যান অভূতপূর্ব হর্ষবর্ধন— দেখলাম. বিরাট সেরেস্তার সামনে সিংহাসনে বসে আছেন যমরাজ। সামনে দপ্তর নিয়ে বসে তাঁর চিত্রগুপ্ত, কেউ না বলে দিলেও তাঁর দিকে তাকালেই তা মালুম হয়। যমদূতরা সব ইতস্তত খাড়া।

যমরাজ আমাকে দেখে দেখে গুপ্তমশাইকে ডেকে বললেন—'দেখত হে, এর পাপ-পুণ্যের হিসাবটা ছাখো তো একবার।'

খতিয়ান দেখে চিত্রগুপ্ত জানালেন—'প্রভু! এর পুণ্যকর্মই বেশি দেখছি। তবে পাপও করেছে কিছু কিছু।'

'কী পাপ?'

'আজ্ঞে ভ্যাজালের কারবার। ভারতখণ্ডের বেশির ভাগ লোকই যা করছে আজকাল।'

'কিসে ভ্যাজাল দিত লোকটা?'

'কাঠের ভ্যাজাল।'

'প্রভু! কাঠ কি কোনো খাবার জিনিস না ওষুধপত্তর, যে তাতে আমি ভ্যাজাল দিতে যাব?' প্রতিবাদ না করে পারলাম না আমি

—'কাঠ কি কেউ খায় কখনো? না, কাঠে কেউ ভ্যাজাল দিতে যায়? কাঠের আবার ভেজাল হয় না কি?'

'কিন্তু হয়েছে। চিত্রগুপ্ত বললেন—'লোকটা দামী সেগুন কাঠ বলে বাজে বেগুনকাঠের ভ্যাজাল চালাত।

'আপনি অবাক করলেন গুপ্তমশাই!' আমি বললাম তখন—'পাট গাছ থেকে যেমন ধান হয়ে থাকে, সেই রকম কথাটাই বলছেন না আপনি? বেগুন গাছের থেকে কাঠ হয় নাকি আবার? পাটগাছের থেকে তবু পাটকাঠি মেলে, কিন্তু বেগুন গাছের থেকে কাঠ দূরে থাক একটা কাঠিও যে পাওয়া যায় না মশাই।'

'বেগুন মানে গুণহীন, নির্গুণ, বাজে।' ব্যাখ্যা করে দিলেন চিত্রগুপ্ত। 'দামী বলে বিলকুল বাজে কাঠ ছেড়েছ তুমি বাজারে।'

কথাটা মেনে নিতে হয় আমায়। —'তা ছেড়েছি বটে প্রভু! কিন্তু দেখুন, শাস্ত্রেই বলেছে আমাদের—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। সদা মহাজনের পথে চলিবে। আমিও সদা সিধে তাই চলেছি। মহা মহা ব্যক্তিরা কে নয়?—নানাভাবে ভ্যাজাল চালাচ্ছে এখন—বেপরোয়া চালিয়ে যাচ্ছে—তাই দেখে আমিও…'

যমরাজ বাধা দিলেন আমার কথায়—'চিত্রগুপ্ত, এর জন্য, কতদিন নরকবাসের দণ্ড দেয়া যায় লোকটাকে?'

ধর্মরাজ! বিশ বছর তো বটেই। পাপের বিষ ক্ষয় হতে ঐ বিশ বছরই যথেষ্ট—বিশে বিষক্ষয় হয়ে যাক…তবে এর স্বর্গবাসের সময়টাই ঢের বেশি আরো…।'

ধর্মরাজ তখন আমার দিকে তাকালেন—'তুমি আগে স্বর্গভোগ করতে চাও, না নরকভোগটাই করবে আগে?

'যা আপনি মঞ্জুর করবেন!' কৃতাঞ্জলিপুটে আমি বললাম। আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে যমরাজ নিজের হাতের নোখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলাম, তার হাতের নোখগুলো বেড়েছে বেজায়—দেখবার মতই হয়েছে সত্যি!

বললাম—'অবিলম্বে আপনার নোখ কাটার দরকার কর্তা! বড্ডো বড় হয়েছে যথার্থই! যদি অনুমতি করেন আর একটা নরুণ পাই, অভাবে ব্লেড, তাহলে আমিই কেটে দিতে পারি।'

'নোখ না, আমি নখদর্পণে তোমার কলকাতার পরিস্থিতিটা দেখছিলাম।'

'আজ্ঞে, কলকাতায় আমার কোনো পরিস্থিতি নেই। আমার পেত্নীস্থিতি। আমার বাড়িতে যিনি আছেন কোনোক্রমেই তাঁকে পরী বলা যায় না। পেত্নী বললেই ঠিক হয়। এমন দজ্জাল ঘ্যান-ঘেনে আর খ্যানখেনে কুঁদুলে বৌ আর দুটি এমন দেখিনি। পেত্নী নিয়েই হয়েছে আমার ঘর করা…।'

'যদি তোমাকে বাঁচিয়ে আবার তোমার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়?'

'দোহাই হুজুর, তাহলে আমি মারা পড়বো। মারা যাবো আবার আমি। অমন বৌয়ের কাছে আমি ফিরে যেতে চাইনে, তার চেয়ে নরকেও যাব আমি বরং।'

দেখছিলাম তাই। তোমার ঘরের পরিস্থিতি এই, বাইরের পরিস্থিতি যা দেখছি, কলকাতায় তা আরো ভয়াবহ…রাস্তায় খানাখন্দ, আর আঁস্তাকুড়েব গন্ধ, যত রাজ্যের জঞ্জাল। ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা আপিসে আপিসে ঘেরাও, চালে কাঁকর, তেলে ঘিয়ে ভেজাল, চিনিতে বালি, বালিতে গঙ্গামাটি, দুধে জল যে রকমটা দেখলাম আমার এই নখদর্পণে তাতে মনে হয় কলকাতাটাই এখন নরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কও বললে চিত্রগুপ্ত। বিশ বছরের নরকবাস না! তোমার আয়ু বিশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হলো আরো। যাও, গিয়ে তোমার কলকাতা গুলজার করো গে।'

আর, তারপরই আমি বেঁচে উঠলাম তৎক্ষণাৎ। বলে হর্ষবর্ধন একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

● ● ● ● ● ● ●

চোর ধরলো গোবর্ধন

'নাঃ, বিজ্ঞাপনে কাজ হয় সত্যিই !

হর্ষবর্ধন এসে ধপ করে বসলেন আমার ডেকচেয়ারে। হাঁফ ছেড়ে বললেন কথাটা।

'হ্যাঁ, কথাটা আপনার যেমন বিজ্ঞাপনসম্মত তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও বটে।' বিজ্ঞজনের মতই তাঁর কথায় আমার সায়।

'সেদিন আপনাকে দিয়ে আনন্দবাজারে বার করার জন্যে সেই বিজ্ঞাপনটা লিখিয়ে নিয়ে গেলুম না ?......'

'হ্যাঁ, মনে আছে আমার।' আমি বললাম : 'রাতের পাহারা দেবার জন্য লোক চাই— সেই ত ?'

'আমাদের কাঠের কারখানায় রোজের বিক্রির বহু টাকা পড়ে থাকে ক্যাশ বাক্সে, বাড়ি নিয়ে আসা সম্ভব হয় না, পরদিন সে টাকা সোজা গিয়ে জমা পড়ে ব্যাঙ্কে— সেই কারণে, রাত্রে টাকাটা আগলাবার জন্যেই কারখানায় থাকবার একজন সুদক্ষ লোক চেয়েছিলাম আমরা।...'

'রাতের চার প্রহর পাহারা দেবার জন্য সুদক্ষ এক প্রহরী। বেশ মনে আছে আমার।' আমি বলি : 'আমিই ত লিখে দিলাম কপিটা। তা, কিছু ফল পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ?'

'পেয়েছি বইকি ফল। বলতে কি, সেই কথাটা জানাতেই ত আপনার কাছে ছুটে আসা।'

'ফল বলতে !' গোবরাও এসেছিল দাদার সঙ্গে : 'রীতিমতন প্রতিফল পাওয়া গেছে বলা যায়।'

'কটা সাড়া এলো ?' আমি শুধাই।

'আপাতত একটাই।' ওর দাদা বলেন : 'ক্রমশ আরও সাড়া

পাবো আশা করছি। আপাতত একটাই।'

'ওই একটাতেই সাড়া পড়ে গেছে।' সাড়া পাওয়া যায় গোবরারও!—'সাড়া পড়ে গেছে সারা চেতলায়।' সে জানায়।

'দু ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের দরুন দুশো টাকা। তা নিক তাতে দুঃখ নেই। সে দু ইঞ্চিরই বা দাম দেয় কে?'

'দুশো টাকার বিজ্ঞাপন দিলে অন্তত তার দুশো গুণ লাভ ত হয়ই কারবারে—তা নইলে লোকে দেয় কেন?'

'এখানেও বেশ লাভ হয়েছে লোকটার। দুশো গুণেরও ঢের বেশি।'

'প্রায় ছয়শো গুণ তাই না দাদা হিসেব করে বলে ভাইটি ঃ 'ষাট হাজার টাকার মতই ছিল না বাক্সটায়?'

'প্রায় আশি হাজারের কাছাকাছি। বিলকুল ফাঁক!'

'আশি হাজার টাকা হলে কত হয়?' গোবরা আঙুল দিয়ে আকাশের গায় পারসেণ্টের আঁক কষতে লাগে।

আমার সামান্য বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে ওদের হিসেবের নাগাল পাই না 'বিলকুল ফাঁক। তার মানে?' শুধাই দাদাকে।

'মানে কাল সকালের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরুল না আমাদের? আর কাল রাত্তিরেই কারখানায় সিঁধ কেটে চোর ঢুকে সমস্ত টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আজ কারখানা খুলতে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স ভাঙা।'

'অ্যাঁ?' আঁতকে উঠি আমি ঃ 'তা খবর দিয়েছেন পুলিসে?'

'পুলিসে খবর দিয়ে কী হবে? আমাদেরই পাকড়ে নিয়ে যাবে থানায়। এইসা টানা হ্যাঁচড়া লাগাবে যে বাপ ডাক ছাড়তে হবে। এখন নিজেদের কারবার দেখব না থানা-পুলিস করব?' বলেন হর্ষবর্ধন ঃ 'আর চোর যা ধরবে ওরা তা আমার জানা আছে বিলক্ষণ!'

'আমি ধরতে পারি চোর।' বলল গোবরা ঃ 'তা দাদা আমায় ধরতেই দিচ্ছে না।'

'হ্যাঁ বললেই হলো চোর ধরবো! ওদের কাছে ছোরা ছুরি থাকে না? ধরতে গেলেই ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে! ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে এক কথায়। ওর মতন নাবালক একটা ছোঁড়াকে আমি ছুরির মুখে ঠেলে দেব—আপনি বলছেন?'

'কি করে বলি!' বলতে হয় আমায়ঃ 'ওসব ছোরাছুরির ব্যাপারে আমাদের বয়স্কদের না থাকাই ভালো।'

'আমি কিন্তু অক্লেশে ধরে দিতাম। কোনো ছোরাছুরির মধ্যে না গিয়েও—স্রেফ গোয়েন্দাগিরি করেই।'

'কি করে ধরতিস?'

'ঐ মাটি ধরেই।

'ও মাটিতে বুঝি পায়ের ছাপ পড়েছে চোরের?' আমি কৌতূহলী হইঃ 'কারখানার মাটিতে পায়ের দাগ রেখে গেছে চোররা! কবরখানা খুঁড়ে গেছে নিজের?'

'দাগ না ছাই!' মুখ বিকৃত করেন হর্ষবর্ধনঃ 'সিগ্রেটের ছাইও ফেলে যায়নি একটুকু। কী নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি শুনি?'

'কারখানার মাটি নয়, সেই মাটি। বলে না যে—মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে? সেই মাটি ধরেই আমি চোর ধরব।' ফাঁস করে গোবরা। বিজ্ঞাপনটা দিয়ে মাটি হয়েছে ত! ঐ মাটি দিয়েই আমার কাজ হাসিল করব আমি।' হাসিখুশি হয়ে সে জানায়।

ওর রহস্যের আমি থই পাই না। এমন কি ওর দাদাও থ হয়ে থাকেন।

'হ্যাঁ চোর ধরবে গোবরা!' বলে তিনি উসকে উঠলেন একটু পরেইঃ 'তাহলে···তাহলে তখন ধরলো না কেন? এর আগেও ত জিনিস চুরি গেছল আমাদের।'

'এর আগেও গেছে আবার?'

'হ্যাঁ আমিই তো চুরি গেছলাম।' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন।

'তোমার জিনিস নাকি?' প্রতিবাদ করে গোবরাঃ 'বৌদির

জিনিস না তুমি? তুমি কি তোমার নিজের জিনিস—নিজস্ব?

'ওই হলো?' বলে ফোঁস করলেন দাদা: কেন তুইও কি চুরি যাসনি আমার সঙ্গে? তুই ত আমার জিনিস। আমি তোর অভিভাবক না? তখন চোর ধরতে কী হয়েছিল তোর?

'তারপর? চোরের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন কি করে। আমি জিজ্ঞেস করি।

'যেমন করে পায় মানুষ।' তিনি জানান: 'চুরির ধন বাটপাড়িতে যায় শোনেননি? তারপর চোরের হাত থেকে বাটপাড়ের হাতে গিয়ে পড়লাম আমরা।'

'বটে বটে' আমার সকৌতুক কৌতূহল: 'তা শেষমেষ উদ্ধার পেলেন ত? পেতেই হবে উদ্ধার শেষ পর্যন্ত। গোয়েন্দাকাহিনীর দস্তুর। তা উদ্ধার করল কেটা?'

'ডাকাত এসে পড়ল শেষটায়। ডাকাত আসতে দেখেই না বাটপাড় ব্যাটা ভোঁদৌড়!'

'ডাকাত এসে পড়ল আবার তার ওপর?'

'হ্যা, ওর বৌদি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে যেই না দোরগোড়ায় এসে হাঁকডাক শুরু করেছে তাই না শুনে নিচে উঁকি মেরে দেখেই না, সেই বাটপাড়টা সঙ্গে সঙ্গে উধাও! খিড়কির দোর দিয়ে সটাং!··· বৌ না তো ডাকাত।'

'আমার ডাকসাইটে বৌদির নামে যাতা বলো না বলে দিচ্ছি।' গোঁসা হয় গোবর্ধনের।

'ওই হলো! তোর কাছে যা ডাকসাইটে আমার কাছে তাই ডাকাতসাইটে।'

'যেতে দিন।' পারিবারিক কলহের মাঝখানে পড়ে আমি মিটিয়ে দিই: 'আপনাদের চুরি যাওয়ার কাহিনীটা বলবেন ত আমায়। সেবারকার আপনাদের যুদ্ধে যাওয়ার গল্পটা বলেছিলেন, তাই লিখে দু পয়সা পিটেছিলাম, এবার এটার থেকেও···

'বলব আপনাকে এক সময়। কারখানার জন্য এখন একটা লোহার সিন্দুক কিনতে যাচ্ছি। চোর বাবাজী আবার ঘুরে এলেও সেটা ভাঙা আর সহজ হবে না তার পক্ষে এবার।'

পরদিন সকালে শ্রীমান গোবর্ধন এসে হাজির। 'দেখুন এই বিজ্ঞাপনটা যাচ্ছে আজ আনন্দবাজারে, দেখুন ত ঠিক হয়েছে কিনা?'

গোবর্ধন তার কালজয়ী সাহিত্যকীর্তিটি আমার হাতে দেয়।

বিজ্ঞাপনের কপিটিতে ওদের চেতলার বাসার ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে দেখলাম—প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবশ্যক। আমাদের বাড়ির একটি ঘরে বহুমূল্য তৈজসপত্র রক্ষিত আছে, সেই ঘরের গা-লাগাও একটা জলের পাইপ উঠে গেছে সোজা উপরে—সেই নল বেয়ে কেউ যাতে না উঠতে পারে সেই দিকে সারা রাত্রি নজর রাখার জন্য বিচক্ষণ এক গোয়েন্দার প্রয়োজন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক।'

'বুঝেছি! জলে যেমন জল বাধে' আমি ঘাড় নাড়লাম, তেমনি বিজ্ঞাপনটা দিয়ে এ রকম আরেকটা কাণ্ড বাধাবে তুমি দেখছি। চোরটা যে পাইপ বেয়ে উঠবে আর তোমার ঐ ডিটেকটিভ গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াবে তাকে। এই তো?'

'সে আপনি বুঝবেন না। সেসব আপনার মাথায় খ্যালে না।' বলে চলে গেল গোবরা।

দিনকয়েক বাদে একটা লোক এসে ডাকছে আমায় 'আসুন আসুন। চটপট চলে আসুন আমার সঙ্গে।'

অপরিচিত আহ্বানে আমি থতমত খাই—'আপনি···আপনাকে তো আমি···।'

'চিনতে পারছেন না আমাকে? ছদ্মবেশে রয়েছি কিনা,' বলে লোকটা তার গোঁফদাড়ি খুলে ফ্যালে।

'ওমা! গোবরা ভায়া যে! এমন অদ্ভুত বেশ কেন হে?—এর মানে?'

'চোর ধরতে যাচ্ছি না? ডিটেকটিভকে ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করতে হয় না তো? আপনার জন্যেও একজোড়া দাড়িগোঁফ এনেছি, পরে নিন চট্ করে…'

'আমি আমি, আমি আবার পরব কেন?'

'আপনাকেও ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে না? আপনি আমার শাগরেদ তো এ যাত্রায়। ব্লেকের যেমন স্মিথ, বিমলের যেমন কুমার। তেমনি আমার সমযোগী গোয়েন্দা যখন তখন আপনাকেও…'

'তুমি পরলেই হবে। আমাকে আর পরতে হবে না ছদ্মবেশ। বললাম আমি: 'দাড়িওয়ালা লোকের ছায়া আমি মাড়াই নে, জানে সবাই। তোমার সঙ্গে ঘুরলে কেউ আর আমায় আমি বলে সন্দেহ করবে না।

'তাহলে চলো আসুন চটপট। এই ফাঁকে চেতলার বাজারটা ঘুরে আসি একবার।' বলল সে: 'দাদাও আবার বাজার করতে বেরিয়েছেন কিনা এখন। পাছে আমায় চিনতে পারেন, আমার ছদ্মবেশধারণের সেও একটা কারণ বটে—বুঝলেন?'

'বুঝেছি।' বলে বেরুলাম ওর সঙ্গে। বাজারের মুদিখানাগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা লোককে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠছে গোবরা—'ধরেছি—ধরেছি চোর! পাকড়েছি ব্যাটাকে। একটা পাহারাওলা ডেকে আনুন তো এইবার।

কোনই দোষ করেনি লোকটা। মুদীর দোকানের তেজপাতার দরকষাকষি করছিল কেবল, এমন সময় গোবরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। এমন খারাপ লাগল আমার!

লোকটা বাবারে মারে বলে হাঁক পাড়তে লাগল: আর গোবরাও দাদাগো! বৌদিগো! বলে চেঁচাতে থাকে।

কাছেই কোথাও বুঝি বাজার করছিলেন দাদা! ভায়ের হাঁক-ডাকে এসে হাজির - 'কী হয়েছে রে? এমন ষাঁড়ের মতন চিল্লাচ্ছিস কেন?'

'পাকড়েছি তোমার চোরকে—এই নাও ধরো।'

লোকটা তখন হর্ষবর্ধনের পা জড়িয়ে ধরে—'দোহাই বাবু! আমাকে পুলিসে দেবেন না। দোহাই! সেদিন আমি দু বচ্ছর খেটে বেরিয়েছি এবার গেলে ছ-বচ্ছরের জন্য ঠেলে দেবে জেলে।'

'বেশ দেব না পুলিসে। বের করে দাও আমাদের মালপত্তর।' গোবরার তম্বি।

'সব বার করে দেব বাবু—চলুন! সকৃতজ্ঞ লোকটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে তার বস্তির কুঠরিতে যায়। বের করে দেয় হর্ষবর্ধনের আশি হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল।

'আর আমার তৈজসপত্র? সে-সব গেল কোথায়?'

গোবরার রোয়াব।

'ওই যে কোণায় ধরা রয়েছে বাবু! নিয়ে যান দয়া করে।'

ঘরের কোণে দুটো বস্তা পাশাপাশি খাড়া-করা দেখলাম। এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি···গিয়ে উঁকি মেরে দেখি······দেখছি যে······

'এই কি তোমার······'

'তৈজসপত্র।' জানায় গোবর্ধন। 'তেজপাতাকে সাধু ভাষায় কী বলে তাহলে? তৈজসপত্র বলে না? লেখক মানুষ হয়ে আপনি বাংলাও জানেন না ছাই?'

অবাক করল গোবর্ধন! কী বলে ও? বাঙালি লেখক হতে হলে আবার বাংলা ভাষা জানতে হয় নাকি? আশ্চর্য।

হর্ষবর্ধনের কাব্য চর্চা

বাড়ির দরজায় কে যে এক-পাল ছাগল বেঁধে গেছল, তাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁয় পাড়াটা মাত। হর্ষবর্ধন তখন থেকে উঠে-পড়ে লেগেছেন, কিন্তু মনই মেলাতে পারছেন না, তা কবিতা মেলাবেন কী!

'দূর ছাই!' বিরক্ত হয়ে বলছেন হর্ষবর্ধন, 'পাঁঠার সঙ্গে খালি পেটের মিল হতে পারে—কবিতার মিল হয় না। পাঁঠারা অপাঠ্য।'

আজই একটু আগে গোবরার হাতে তিনি মোটা খাতাটা দেখেছিলেন। চামড়ায় বাঁধানো চকচকে—অবিকল বইয়ের মতো। কৌতূহল প্রকাশ করায় গোবরা জানিয়েছিলো—'এটা আমাদের খাতা, আমরা কবিতা লিখবো। পরে ছাপা হয়ে বই আকারে বেরুবে! আমাদের কবিতার বই।

'আমরা—মানে? আমরা কারা?' ভাইয়ের কথায় দাদা একটু ঘাবড়েই গেছেন।

'আমরা অর্থাৎ তুমি আর আমি। আবার কে?' গোবরা ব্যক্ত করেছে।

'আমি! আমি লিখবো কবিতা। কেন, কি দুঃখে? হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েছেন: 'আমাদের কাঠের কারবার বেঁচে থাক। কবিতা লিখতে যাবো কিসের দুঃখে?'

'চিরটা কাল তো আকাট হয়েই কাটালেন। কেন, কবি হওয়াটা কি খারাপ?'

'ধুত্তোর কবি! কী পাপ করেছি যে আমায় কবিতা লিখতে হবে!' হর্ষবর্ধনের কভি-নেহি মেজাজ।

'কেন, পাপ কিসের!' গোবরা জবাব দিয়েছে, কবিতা লেখা কি পাপ? ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-কৃত্তিবাস, ওমর-ওমর—'

বলতে বলতে গোবরার কোথায় যেন আটকে যায় :

'দূর বোকা! ওমর নয়, অমর! জানি কবিতা লিখে এরা সবাই অমর। জানা আছে।' হর্ষবর্ধন ভাইকে জানাতে দ্বিধা করেন না।

'অমর নয়, ওমর। আরেকজন নামজাদা কবি—তাঁর নামের সঙ্গে আরো দু-দুটো খাবার জিনিস জড়ানো কিনা। খাবারগুলো আমার মনে আসছে না ছাই।'

'ওমরত্ব ছাড়াও দুরকমের খাবার? ভাল খাবার?' ঠিক কাব্যরস না হলেও হর্ষবর্ধনের জিভে এক রকমের রস জমে।

'মনে পড়েছে। এই আর আম। ওমর খৈআম। হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাও ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস আর আমাদের এই ওমর খৈআম—এঁরা সবাই কবিতা লিখে পাপ করে গেছেন?'

'ওমর খৈআম আমি পড়িনি। তবে খই আমের মতো ভাল হবে কি না বলতে পারবো না।' হর্ষবর্ধন আসল প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যান।

'আমি পড়েছি। দই-চিঁড়ের চেয়েও ভাল।' গোবরা নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে, 'ঢের উপাদেয়।'

'তা ভাল হতে পারে। কিন্তু কবিতা লেখা ভারি শক্ত। মেলাতে হয়। কবিতা মেলাতেই অনেকের প্রাণ যায়। ওমরের কথা জানি না, আর সবাই মরো-মরো।'

'কিছু শক্ত না। তুমি এই ভূমিকাটি পড়ে দেখো। জনৈক আস্ত লেখকের লেখা। লোকটাকে হয়তো কবিও বলা যায়। হ্যাঁ রীতিমত টাকা দিয়ে লেখাতে হয়েছে—নগদ এক-কুড়ি টাকা। বইটা লেখবার আগেই বইয়ের ভূমিকাটি লিখিয়ে রাখলাম। কাজ এগিয়ে রইল।'

মোটা খাতাটার গোড়াতেই একটা গোটা প্রবন্ধ—কোন এক আস্ত লেখকের লেখা ছোট্ট এক ভূমিকা—ভূমিকাটার মাথায় বিশদ করে জানানো—'কবিতা লেখা মোটেই কঠিন না।' হর্ষবর্ধন ভূমিকার

মাথাটা পড়েন, কিন্তু মোটেই তার ভেতরে মাথা গলান না। এমনিতেই তিনি মাথা নাড়েন : 'না' শক্ত না! খুব শক্ত। এ কি বাপু কাঠ যে হাটে গেলেই মিলে যায়? এ হলো কবিতা। মেলা দেখি কবিতার সঙ্গে? খবিতা, গবিতা, ঘবিতা, ঙবিতা, চবিতা ছবিতা, জবিতা—মায় ইস্তক হবিতা পর্যন্ত কিছু মেলে না। কবিতা লেখা কি সহজ রে বাপ্! বললেই হলো আর কি!'

'এই আস্ত লেখকটা তাহলে আস্ত গুল ঝেড়েছে, এই তুমি বলতে চাও তো?'

'আলবৎ! কবিতা মেলাতে হয়, নইলে কবিতাই হয় না। আর মেলানো ভারি শক্ত। দু-রকমের মেলা আছে, রথের মেলা আর কবিতার মেলা—কিন্তু দুটো মেলা একেবারে আলাদা রকমের। রথের মেলা ঠিক সময়ে আপনিই মেলে, কিন্তু কবিতা মেলায় কার সাধ্যি! তোর লেখক গুল না ঝাড়তে পারে, কিন্তু ভুল করে দুটো মেলায় গুলিয়ে ফেলেছে বলে বোধ হচ্ছে।'

'জানি, জানি।' গোবরা ঘাড় নাড়ে : মিলও তোমার দুরকমের। কবিতার মিল, আবার কাপড়ের মিল। কিন্তু মিল ছাড়াও যেমন কাপড় হতে পারে—ধরো যেমন তাঁতের কাপড়, তেমনি তোমার বিনা মিলেও কবিতা বানানো যায়। পড়ে দেখো না ভূমিকাটা।'

'আচ্ছা, যা তুই! ঘন্টাখানেক পরে আসিস। আমি তোকে এমন একটা লম্বা কবিতা বানিয়ে দেবো যে তোর তাক লেগে যাবে। পারিস তো কোন কাগজে কিছু টাকা দিয়ে তোর নামে ছাপিয়ে দিস। তোর নামে উইল করে দিলাম।'

এই বলে শ্রীমান ভ্রাতৃরত্নকে ভাগিয়ে দিয়ে 'আমাদের কবিতার খাতা' নামক মরোক্কো চামড়ার বাঁধাই মোটা খাতাটাকে নিয়ে তিনি পড়েছেন। লাইন দুয়েকের কবিতা দেখতে না দেখতেই তাঁর এসে গেছে—পলায়মান তাদের ধরে-পাকড়ে খাতার পাতায় তিনি পেড়ে

ফেলেছেন। লাইন ছুটি এই ঃ

মুখখানা থ্যাবড়া।
নাম তার গোবরা॥

কিন্তু এই দু-ছত্রের পরে আর একছত্রও তাঁর নিজের কিংবা কলমের মাথায় আসছে না। বাড়ির তলায় ছাগলের সমবেত ঐকতান—সেই ছাগলাদ্য সঙ্গীত-সুরধুনী ভেদ করে কাব্য-সরস্বতীর সাধ্য কি যে তাঁর খাতার দিকে পা বাড়ায়! অগত্যা, বিতাড়িত হয়ে তিনি ভূমিকাটা নিয়ে পড়েছেন—তার মধ্যে যদি গোবরা-কথিত কবিতা লেখার সত্যি কোন সহজ উপায় থাকে।

ভূমিকাটার আরম্ভ এই ঃ

'তোমাদের নিশ্চয় কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমরা হয়তো ভেবেছো, ওটা খুব শক্ত কাজ। কিন্তু মোটেই তা নয়। কবিতা লেখার মতো সহজ কিছুই নেই। নাটক গল্প প্রবন্ধ—এ-সব খুব কষ্ট করে লিখতে হয়, কিন্তু কষ্ট করে একটি জিনিস লেখা যায় না, তা হচ্ছে কবিতা। খুব সহজে ও আসবে, নয়তো কিছুতেই ও আসবে না। সহজ না হলে কবিতাই হলো না।'

এই অবধি পড়ে হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন ঃ 'আরে, আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলছি। কষ্ট করে কখনোই কবিতা লেখা যায় না। আর দেখো তো এই গোবরার কাণ্ড! আমার ঘাড়ে ইয়া মোটা একটা জাবদা খাতা চাপিয়ে গেছে—আমি অনর্থক কষ্ট করে মরছি। যতো সব অনাসৃষ্টি। দেখো না!'

হর্ষবর্ধন আবার ভূমিকার মধ্যে আরেকটু অগ্রসর হন—

'নির্মল জলে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তেমনি মানুষের মনে কবিতার মায়া লাগে। মনের সেই আকাশকে রঙে রেখায় ধরে রাখলেই হয় ছবি, আর কথায় বাঁধলেই হয় কবিতা। তোমাদের মনে যখন যে ভাব জাগে তাকে যদি ভাষায় জাহির করতে পারো তাই হবে, কবিতা—যেটা যতো ভাল প্রকাশ হবে, কবিতাও হবে ততো

চমৎকার।'

অতঃপর হর্ষবর্ধন নিজের মনের মধ্যে হাতড়াতে শুরু করেন। কিন্তু সমস্তই তাঁর শূন্য বলে মনে হতে থাকে। অবশেষে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—তাহলে আর আমি কি করে কবি হবো।

ভূমিকায় আরো ছিল।

'শরীরের যেমন ব্যায়াম দরকার, যেমন বই পড়া আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন কবিতা লেখাব। বই পড়লে—চিন্তা করলে হয় মস্তিষ্কের ব্যায়াম, কবিতা-চর্চায় মনের। ভাবের ভাণ্ডার যত পূর্ণ হবে, মন হবে ততই বড়ো—ততই অগাধ। ভাব এলেই লিখে ফেল। তাহলে সেই প্রয়াসের দ্বারাই ঘুরে ফিরে সেই ভাব তোমার চেতনা বা অব-চেতনার মধ্যে গিয়ে জমা হয়ে থাকলো। ভাবনা হচ্ছে, মৌমাছির মত যদি উড়ে যেতে দিতে তো খানিক গুন-গুন করেই ও চলে গেলো —আর কখনো ফিরে না আসতেও পারে। কিন্তু কথার রূপগুণের মধ্যে—ভাষার মৌচাকে যদি ওকে ধরতে পারো তাহলে মধু না দিয়ে ও যাবে না। সেই মধুই হলো আসল। এবং তোমার সেই মনের মধু যখন পাঠকের মনকেও মধুময় করতে পারে তখনই তোমার কবিতা হয়ে ওঠে মধুর। তখনই তার সার্থকতা।

'কবিতার আসল কথা হচ্ছে—তা কবিতা হওয়া চাই। ছন্দ, মিল ইত্যাদি না হলেও তার চলে। ছন্দ যদি আপনিই এসে যায়, মিল যদি অমনি পাও, বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু ও না হলেও কবিতার কোন হানি হয় না। আকাশের সঙ্গে বাতাস বেশ মিল খায়, আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর কোথাও মিল নেই। অথচ আকাশ আর পৃথিবী মিলে চমৎকার একটা কবিতা।'

ভূমিকাটা, দু-একটা উদাহরণের পরে এইভাবে শেষ। পরিশেষে পৌঁছে হর্ষবর্ধন মুখ বাঁকান: 'জানি, জানি। এ সবই আমার জানা। তুমি আর নতুন কথা আমাকে কি শেখাবে বাপু! তোমার চেয়ে ঢের ভাল ভূমিকা আমি লিখে দিতে পারি। আরে বাপু, কে

না জানে 'শ্রীরৎস' লিখলেই 'বীভৎস' দিয়ে মেলাতে হয়। 'কার খোকা' আনলেই অমনি 'ছারপোকা'কে আমদানি করতে হবে। 'গাড়ি ভাড়া' করলে 'ভারি তাড়া' না হয়ে আর যায় না! সবাই জানে, তুমি আর বেশি কি বলবে! কিন্তু একপাল ছাগল আর তাদের কান কাটানো চ্যাঁ-ভ্যাঁর সঙ্গে যদি মেলাতে পারতে তাহলে জানতুম যে, হ্যাঁ—তুমি একজন আস্ত জাত কবি। এমন কি তোমাকে আমি কবি অমর মুড়ি-কাঁঠাল বলে মানতেও রাজি ছিলাম।'

গোবরা এসে এতক্ষণ পরে উঁকি মারে—'কি দাদা? কদ্দুর? বেরুল তোমার কবিতা?'

'হয়েছে, খানিকটা হয়েছে। দু-ছত্তর তোর বইয়ের ওপর গজিয়েছে, আর দু-ছত্তর আমার মাথায় গজগজ করছে, এখনো খাতায় ছাড়িনি!'

'দেখি তোমার কবিতা?' গোবরা কাব্য-গঞ্জনা শুনতে উৎসুক হয়।

কিন্তু খাতার দু-লাইন—'মুখখানা থ্যাবড়া, নাম তার গোবরা' দেখেই—নিজের মুখের সঙ্গে সে মিলিয়ে দেখে কি না বলা যায় না—গোবরার মুখ কবিতার আরেকটা মিল হয়ে ওঠে—একেবারে গোমড়া হয়ে ওঠে।

'আরে এখনি অবাক হচ্ছিস! আরো দু-লাইন আছে—বলছি শোন্! হর্ষবর্ধন বাকি পংক্তিগুলোকেও নিজের দন্তপংক্তির সঙ্গে প্রকাশ করে দেন—'বাকিটাও শোন্ তবে—শুনলে খুশিই হবি—

তলায় এক পাল ছাগল!
আর ওপরে তুই এক-পাগল॥'

'এই চার লাইনেই আমার অমরত্বলাভ। আজকের মতো এই যথেষ্ট। কেমন হয়েছে কবিতাটা? ওমর খৈআমের সমকক্ষ হয়তো হইনি, কিন্তু ওমর মুড়কিজাম কি বলা যায় না আমায়?'

———

● ● ● ● ● ● ●

হর্ষবর্ধনের সূর্য-দর্শন

সূর্যদর্শন না বলে সূর্যগ্রাস বললেই ঠিক হয় বোধ হয়।

রাহুর পরে এক মহাবীরই যা সূর্যদেবকে বগলদাবাই করেছিলেন. কিন্তু যত বড়ো বীর বাহুই হন না, হর্ষবর্ধনকে হনুমানের পর্যায়ে কখনো ভাবাই যায় না!

তাই তিনি যখন এসে পাড়লেন, 'সূয্যি মামাকে দেখে নেবো এইবার', তখন বলতে কি আমি হাঁ করে গেছলাম।

আমার হাঁ-কারের কোনো জবাব না দিয়েই তিনি দ্বিতীয় হেঁয়ালি পাড়লেন, 'সুন্দরবনের বাঘ শিকার তো হয়েছে, চলুন এবার পাহাড়ে বাঘটাকে দেখে আসা যাক।'

'যদ্দুর আমার জানা' না বলে আমি পারলাম না, 'বাঘরা পাহাড়ে বড়ো একটা থাকে না। বনে জঙ্গলেই তাদের দেখা মেলে। হাতিরাই থাকে পাহাড়ে। পাহাড়দের হাতিমার্কা চেহারা—দেখেছেন তো?

'কে বলেছে আপনাকে?' তিনি প্রতিবাদ করলেন আমার কথার, 'টাইগার হিল তাহলে বলেছে কেন? নাম শোনেননি টাইগার হিলের?'

'শুনবো না কেন? তবে সে হিলে, যদ্দুর জানি, কোনো টাইগার থাকে না। বাবুরা বেড়াতে যান।'

'সূয্যিঠাকুর সেই পাহাড়ে ওঠেন রোজ সকালে সে নাকি অপূর্ব দৃশ্য!'

'তাই দেখতেই তো যায় মানুষ।'

'আমরাও যাবো। আমি, আপনি আর গোবরা। এই

তিনজন।'

বিকেলের দিকে পৌঁছলাম দার্জিলিঙে। টাইগার পাহাড়ের কাছাকাছি এক হোটেলে ওঠা গেল।

খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে হোটেলের মালিককে অনুরোধ করলাম—'দয়া করে আমাদের কাল খুব ভোরের আগে জাগিয়ে দেবেন······

'কেন বলুন তো?'

'আমরা এক একটি ঘুমের ওস্তাদ কিনা, তাই বলছিলাম···'

'ঘুম পাহাড়ও বলতে পারেন আমাদের।' বললেন হর্ষবর্ধন- 'যে ঘুম পাহাড় খানিক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমরা! তাই আমাদের এই পাহাড়ে ঘুম সহজে ভাঙবার নয় মশাই।'

'নিজগুণে আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারবো না', গোবরাও যোগ দিলো আমাদের কথায়···'তাই আপনাকে এই অনুরোধ করছি···'

'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণ? আমরা কোলকাতা থেকে এসেছি, অ্যাদ্দুরে এসেছি কেবল সূর্যোদয় দেখবার জন্য।'

'সূর্যোদয় দেখবার জন্য? কেন, কলকাতায় কি তা দেখা যায় না? সেখানে কি সূর্য ওঠে না নাকি?'

'উঠবে না কেন, কিন্তু দর্শন মেলে না। চারধারেই এমন উঁচু উঁচু সব বাড়িঘর যে, সুয্যি ঠাকুরের ওঠা নামার খবর টের পাবার জো নেই।'

তাছাড়া, তালগাছও তো নেইকো কলকাতায়, থাকলে না হয় তার মাথায় উঠে দেখা যেতো···' গোবরা এই তালে একটা কথা বললো বটে তালেশ্বরের মতন!

'তাল গাছ না থাক, তেতালা বাড়ি আছে তো? তার ছাদে উঠে কি দেখা যেতো না?' বলতে চান ম্যানেজার।

'থাকবে না কেন তেতলা বাড়ি। তেতাল, চৌতাল, ঝঁপতাল

সবরকমের বাড়িই আছে। বলে হর্ষবর্ধন তাঁর উল্লিখিত শেষের বাড়ির বিশদ বর্ণনা দেন, 'ঝাঁপতাল বাড়ি নামে যে-সব সাত-দশ তলা বাড়ির থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার তালে ওঠে মানুষ, তেমন বাড়িও আছে বই-কি! কিন্তু থাকলে কি হবে, তাদের ছাদে উঠেও বোধ হয় দেখা যাবে না সূর্যোদয়! দূরের উঁচু উঁচু বাড়ির আড়ালেই ঢাকা থাকবে পূব আকাশ।

'এক হয় যদি মনুমেণ্টের মাথায় উঠে দেখা যায়···আমি জানাই।

'তা সেই মনুমেণ্টের মাথায় উঠতে হলে পুরো একটা দিন লাগবে মশাই আমার এই দেহ নিয়ে···দেহটা দেখেছেন?'

হর্ষবর্ধনের সকাতর আবেদনে হোটেলের মালিক তাঁর দেহটি অবলোকন করেন। তারপরে সায় দেন –'তা বটে।'

'তবেই দেখুন এ-জন্মে আমার সূর্যোদয়ই দেখা হচ্ছে না তাহলে —এই মানবদেহ ধারণ বৃথাই হলো···'

'তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ··'

'এখানে নাকি অবাধে সূর্যোদয় দেখা যায়, আর তা নাকি একটা দেখবার জিনিস সত্যিই···'

'সেই কারণেই 'আপনাকে বলছিলাম···'

আমাদের যুগপৎ প্রতিবেদন –দয়া করে আমাদের ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে তুলে দেবেন। এমনকি, দরকার হলে জোর করেও।

'কোনো দরকার হবে না।' তিনি জানান 'রোজ ভোর হবার আগে এমন সোরগোল বাধে এখানে যে তার চোটে আপনার থেকেই ঘুম ভেঙে যাবে আপনাদের।'

'সোরগোলটা বাধে কেন?'

'কেন আবার? ঐ সূর্যোদয় দেখবার জন্যেই। যে কারণে যেই আসুক না, হাওয়া খেতে কি বেড়াতে কি কোনো ব্যবসার খাতিরে, ঐ সূর্যোদয়টি সবারই দেখা চাই। হাজার বার দেখেও আশ মেটে

না কারো। একটা বাতিকের মত বলতে পারেন।'

'আমরাও এখানে চেঞ্জে আসিনি, বেড়াতে কি হাওয়া খেতেও নয় —এসেছি ঠিক ঐ কারনেই··· ।'

'তাই রোজ ভোর হবার আগেই হোটেলের বোর্ডাররা সব গোল পাকায়, এমন হাঁকডাক ছাড়ে যে, আমরা, মানে এই হোটেলের কর্মচারীরা, যারা অনেক রাতে কাজকর্ম সেরে ঘুমুতে যায় আর অত ভোরে উঠতে চায় না, সূর্য ভাঙিয়ে আমাদের ব্যবসা হলেও সূর্য দেখার একটুও গরজ নেই যাদের, একদম সেজন্য ব্যতিব্যস্ত নয়, তাদেরও বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয় ঐ হাঁকডাকের দাপটে। কাজেই আপনাদের কোনো ভাবনা নেই কিচ্ছু করতে হবে না আমাদের। কোন বোর্ডারকে আমরা ডিসটার্ব করতে চাইনে, কারও বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো আমাদের নিয়ম নয়···তার দরকারও হবে না, সাত সকালেই সেই গোলমালে আপনাদের ঘুম যতই নিটোল হোক-না কেন, না ভাঙলেই আমি অবাক হবো।'

অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের ঘরে আমাদের মালপত্র রেখে বিকেলের জলযোগ পর্ব চা-টা সেরে বেড়াতে বেরুলাম আমরা।

তখন অবশ্যি সূর্যোদয় দেখার সময় ছিল না, কিন্তু তা ছাড়াও দেখবার মতো আরো নানান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মজুদ ছিল তো! সেই সব অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতেই আমরা বেরুলাম।

সন্ধ্যে হয়-হয়। এ-ধারের পাহাড়ের পথঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকাই এখন। একটি ভুটিয়ার ছেলে একপাল ভেড়া চরিয়ে বাড়ি ফিরছে গান গাইতে গাইতে।

শুনে হর্ষবর্ধন আহা-উহু করতে লাগলেন।

'আহা আহা! কী মিষ্টি! কী মধুর···'

'কেমন মুর্ছনা!' যোগ দিল গোবরা। শুনে প্রায় মূর্ছিত হয় আর কি!

'একেই বলে ভাটিয়ালি গান, বুঝেছিস গোবরা? কান ভরে

শুনে নে, প্রাণ ভরে শোন।'

'ভাটিয়ালি গান বোধ হয় এ নয়', মৃদু প্রতিবাদ আমার—'সে গান গায় পুব-বাংলার মাঝিরা, নদীর বুকে নৌকার ওপর বৈঠা নিয়ে বসে। ভাটির টানে গাওয়া হয় বলেই বলা হয় ভাটিয়ালি।'

'তাহলে এটা কাওয়ালি হবে।' সমঝদারের মতন কন হর্ষবর্ধন।

'তাই-বা কি করে হয়? গোরু চরাতে চরাতে গাইলে তাই হতো বটে, কিন্তু Cow তো নয়, ওতো চরাচ্ছে ভেড়া।'

'কাওয়ালিও নয়?' হর্ষবর্ধন যেন ক্ষুণ্ণ হন।

'রাখালী গান বলতে পারো দাদা!' ভাই বাতলায়,' 'ভেড়া চরালেও রাখালই তো বলা যায় ছোঁড়াটাকে।'

'লোকসঙ্গীতের বাচ্চা বলতে পারেন।' আমিও সঙ্গীতের গবেষণায় কারো চাইতে কম যাই না, এই বেড়ালই যেমন বনে গেলে বনবেড়াল হয়। তেমনি এই বালকই বড়ো হয়ে একদিন কেষ্ট-বিষ্টু একটা লোক হবে। অন্তত যখন ওর গোঁফ বেরুবে তখন এই গানকে অক্লেশে লোকসঙ্গীত বলা যাবে। এখন নেহাৎ বালকসঙ্গীত।'

ভেড়ার পাল নিয়ে গান গাইতে ছেলেটা কাছে এলে হর্ষবর্ধন নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলেন—'ওকে কিছু বকশিস দেওয়া যাক। ওমা! আমার মনিব্যাগটা তো হোটেলের ঘরে ফেলে এসেছি দেখছি। আপনার কাছে কিছু আছে? নাকি, আপনিও ফেলে এসেছেন হোটেলে?'

'পাগল! আমি প্রাণ হাত ছাড়া করতে পারি, কিন্তু পয়সা নয়। আমার যৎসামান্য যা কিছু আমার সঙ্গে থাকে—আমার পকেটে আমার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তবে কিনা।...'

বলতে গিয়েও বাধে আমার। চক্রবর্তীরা যে কঞ্জুস হয়, সে-কথা মুখ ফুটে বলি কি করে? নিজ গুণ কি গণনা করবার?

'তাহলে ওকে কিছু দিন মশাই! একটা টাকা অন্তত।'

দিলাম।

টাকাটা পেয়ে তো ছেলেটা দস্তুরমত হতবাক? পয়সার জন্যে নয়, প্রাণের তাগাদার অকারণ পুলকেই গাইছিল সে। তাহলেও খুশি হয়ে, আমাদের সেলাম বাজিয়ে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে সে চলে গেলো।

খানিক বাদে সেই পথে আবার এক রাখাল বালকের আবির্ভাব। সেই ভেড়ার পাল নিয়ে সেইরকম সুর ভাজতে ভাজতে—তাকেও এক টাকা দিতে হয়।

আবার খানিক বাদে আবার আরেক! পঞ্চম স্বরে গলা চড়িয়ে ফিরছে ঐ পথেই।

তার স্বরাঘাতের হাত থেকে রেহাই পেতে' অর্ধচন্দ্র দেওয়ার মতো একটা আধুলি দিয়ে বিদায় করা হলো।

তারপর আরো আরো আরো মেষপালকের গাইয়ে বালকের দল আসতে লাগল পরম্পরায়···ঐ পথে, আর আমিও তাদের বিদায় দিতে লেগেছি। তিনটেকে আধুলি, চারটেকে পঁচিশ পয়সা করে, বাকীগুলোকে পুঁজি হাল্‌কা হওয়ার হেতু বাধ্য হয়েই দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা করে দিয়ে তাদের গন্তব্য পথে পাচার করে দিতে হলো।

'সেই একটা ছেলেই ঘুরে ঘুরে আসছে নাতো দাদা?' গোবরা সন্দেহ করে শেষটায়—'পয়সা নেবার ফিকিরে?'

'সেই একটা ছেলেই নাকি মশাই?' দাদা শুধান আমায়।

'কি করে বলব? একটা ভুটিয়ার থেকে আরেকটা ভুটিয়াকে আলাদা করে চেনা আমার পক্ষে শক্ত। এক ভেড়ার পালকে আরেক পালের থেকে পৃথক করাও কঠিন। আমার কাছে সব ভেড়াই একরকম। এক চেহারা।'

'বলেন কি?' হর্ষবর্ধন তাজ্জব হন।

'হ্যাঁ সব এক ভ্যারাইটি। যেমন এক চেহারা তেমনি এক রকমের স্বরলহরী—কি ভেড়ার আর কী ভুটিয়ার!'

'আসুন তো, পাশের টিলাটার ওপর উঠে দেখা যাক ছেলেটা যায়

কোথায় !'

ছেলেটা যেতেই আমরা টিলাটার ওপরে উঠলাম।

ঠিক তাই ; ছেলেটা এই টিলাটার বেড় মেরেই ফের আসছে বটে ঘুরে···গলা ছেড়ে দিয়ে সুরের সপ্তমে।

কিন্তু এবার আর সে আমাদের দেখা পেল না।

না পেয়ে, টিলাটাকে আর চক্কর না মেরে তার নিজের পথ ধরল সে। তার চক্রান্তের থেকে মুক্তি পেলাম আমরাও।

কিন্তু ছেলেটা আমাকে কপর্দক শূন্য করে দিয়ে গেলো। আরেকটু হলে তার গানের দাপটে আমার কানের সবকটা পর্দাই সে ফাটিয়ে দিয়ে যেত। তাহলেও, কানের সাত পর্দার বেশ কয়েকটাই সে ঘায়েল করে গেছে, শেষ পর্দাটাই বেঁচে গেছে কোন রকমে। আমার মত আমার কানকেও কপর্দকশূন্য করে গেলো।

তাহলেও কোনো গতিকে কানে কানে বেঁচে গেলাম এ-যাত্রায়।

প্রাকৃতিক মাধুরীর প্রচুর ভূরিভোজের পর বহুৎ হণ্টন করে হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেলো।

তখন ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলুঢুলু, পা টলছে। কোনো রকমে কিছু নাকে মুখে গুঁজেই আমাদের ঘরে ঢালাও বিছানায় গিয়ে আমরা গড়িয়ে পড়লাম।

'গোবরাভায়া, দরজা জানলা খড়খড়ি ভালো করে এঁটে দাও সব; নইলে কোনো ফাঁক পেলে কখন এসে বৃষ্টি নামবে, তার কোনো ঠিক নেই।' বললাম আমি গোবর্ধনকে।

'এটা তো বর্ষাকাল নয় মশাই।'

'দার্জিলিঙের মেজাজ তুমি জানো না ভাই। এখানে আর কোনো ঋতু নেই, গ্রীষ্ম নেই, বসন্ত নেই, শরৎ নেই, খালি দুটো ঋতুই আছে কেবল। শীতটা লাগাতার, আর বর্ষণ যখন তখন।'

'তার মানে?'

'চার ধারেই হালকা মেঘ ঘুরছে—নজরে না ঠাওর হলেও। মেঘ-

লোকের উচ্চতাতেই দার্জিলিং তো। জানলা খড়খড়ির ফাঁক পেলেই ঘরের ভেতর সেই মেঘ এসে বৃষ্টি নামিয়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে।'

'বলেন কি!'

'তাই বলছি।' আমি বললাম—'কিন্তু আর বলতে পারছি না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম······'

'ঘুমোচ্ছেন তো! কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে ঘুমোবেন।' হাঁকলেন হর্ষবর্ধন।'

'তেমন করে কি ঘুমোন যায় যায় নাকি?' আমি না বলে পারি না—'চোখ তো বুজতে হবে অন্তত।'

'কিন্তু কান খাড়া রাখুন। কান খোলা রেখে সজাগ হয়ে ঘুমোন। একটু সোরগোল কানে এলেই বুঝবেন ভোর হয়েছে। জাগিয়ে দেবেন আমাদের।'

'দেখা যাবে।' বলে আমি পাশ ফিরে শুই। কান দিয়ে কদ্দুর কতটা দেখতে পারবো, তেমন কোন ভরসা না করেই।

এক ঘুমের পর কেমন যেন একটা আওয়াজে আমার কান খাড়া হয়। আমি উঠে বসি বিছানায়। পাশে ঠেলা দিই গোবরাকে—'গোবরা ভায়া, একটা আওয়াজ পাচ্ছো না?'

'কিসের আওয়াজ?'

'পাখোয়াজ বাজছে যেন। কেউ যেন ভৈরো রাগিণী সাধছে মনে হচ্ছে। ভৈরোঁ হলো-গে ভোরবেলার রাগিণী। ভোরবেলায় গায়।'

'পাখোয়াজ বাজছে?' গোবরাও কান তুলে শোনবার চেষ্টা পায়।

হর্ষবর্ধনও ঘুম থেকে উঠে—'কি হয়েছে? ভোর হয়েছে নাকি?'

'খানিক আগে কিরকম যেন একটা সোরগোল শুনছিলাম'—।

আমি বললাম।

'ভোর হয়েছে বুঝি?'

'ভাবছিলুম তাই। কিন্তু আর সেই হাঁকডাকটা শোনা যাচ্ছে না।'

'শুনবেন কি করে?' বলল গোবরা—'দাদা জেগে উঠলেন যে! দাদাই তো নাক ডাকাচ্ছিলেন এতক্ষণ।'

'কখনো না। বললেই হলো! কখনো আমার নাক ডাকে না, ডাকলে আমি শুনতে পেতুম না নাকি? ঘুম ভেঙে যেতো না আমার?'

'তুমি যে বদ্ধকালা। শুনবে কি করে? নইলে কানের অতো কাছাকাছি নাক! আব ওই ডাকাতপড়া হাঁক তোমার কানে যেতো না?'

'তুই একটা বদ্ধ পাগল! তোর সঙ্গে কথা কয়ে আমি বাজে সময় নষ্ট করতে চাই নে।' বলে দাদা পাশ ফিরলেন—আবার তাঁর হাঁক-ডাক শুরু হলো।

এরপর অনেকক্ষণ পরেই বোধহয়, হর্ষবর্ধনই জাগালেন আমাদের—কোনো সোরগোল শুনছেন?

'কই না তো।' আমি বলি—'বিলকুল চুপচাপ।'

'এতক্ষণেও ভোর হয়নি? বলেন কি! জানলা খুলে দেখা যাক তো···' তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানলাটা খুললেন—'ওমা! এই যে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে···উঠুন! উঠুন! উঠে পড়ুন। চটপট।'

আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

'জামা কাপড় পরে না! সাজগোজ করার সময় নেই—তাছাড়া দেখতেই যাচ্ছেন, কাউকে দেখাতে যাচ্ছেন না। নিন, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন। দেরি করলে সূর্যোদয়টা ফসকে যাবে।'

তিনজনেই শশব্যস্ত হয়ে আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে বেরিয়ে

পড়লাম।

টাইগার হিলের উঁচু টিলাটা কাছেই। হন্তদন্ত হয়ে তিনজনায় গিয়ে খাড়া হলাম তার ওপর।

বিস্তর লোক গিজগিজ করছে সেখানে। নিঃসন্দেহ, সূর্যোদয় দেখতে এসেছে সবাই।

'মশাই। সূয্যি উঠতে উঠতে দেরি কতো?' হর্ষবর্ধন একজনকে শুধালেন।

'সূয্যি উঠতে?' ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে ওঁর কথায় জবাব দিলেন।

'বেশি দেরী নেই আর।' আমি বললাম—'আকাশ বেশ পরিষ্কার। দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত···উঠলো বলে মনে হয়।'

কিন্তু সূর্য আর ওঠে না। হর্ষবর্ধন বাধ্য হয়ে আরেকজনকে শুধান—'সূয্যি উঠচে না কেন মশাই?'

'এখন সূর্য উঠবে কি?' লোকটি অবাক হয়ে তাকান তার দিকে।

'মানে, বলছিলাম কি সূর্য তো ওঠা উচিত ছিলো এতক্ষণ। পূবের আকাশ বেশ পরিষ্কার। সূর্যের আলো ছড়াচ্ছে চারিদিকে অথচ সূর্যের পাত্তা নেই।

'সূর্য কি উঠবে না নাকি আজ?' আমার অনুযোগ।

'ঐ মেঘটার আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য, তাই দেখতে পাচ্ছেন না।' তিনি জানালেন—'মেঘটা সরে গেলেই—'

বলতে বলতে মেঘ সরে গেলো প্রকাশ পেলেন সূর্যদেব!

'ও বাবা! অনেকখানি উঠে পড়েছেন দেখছি! বেলা হয়ে গেছে বেশ। আপসোস করলেন হর্ষবর্ধন—'সূর্যোদয়টা হাতছাড়া হয়ে গেলো দেখছি আজ।'

'ওমা! একি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—'নেমে যাচ্ছে যেন! নামছে কেন সূয্যিটা? নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে যে! এ-কি ব্যাপার?'

'এরকমটা তো কখনো হয় না!' আমিও বিস্মিত হই—'সূর্যের এমন বেচাল ব্যাপার তো দেখা যায় না কখনো।'

'হ্যাঁ মশাই, এরকমটা হয় নাকি এখানে মাঝে মাঝে? একটু না উঠেই নামতে থাকেন আবার—পথ ভুল হয় সূর্যদেবের?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমরা সূর্যোদয় দেখতে এসেছি কিনা, উদীয়মান সূর্য দেখতে না-পাই, উদিত সূর্য দেখেও তেমন বিশেষ দুঃখিত হইনি—কিন্তু একি! উঠতে না উঠতেই নামতে লাগলো যে!'

'আপনার জন্যে কি পশ্চিম দিকে উঠবে নাকি সূর্য? অস্ত যাবার সময় সূর্যোদয় দেখতে এসেছেন?' ঝাঁঝালো গলা শোনা যায় ভদ্রলোকের—

'কোথাকার পাগল সব!' আরেকজন উতোর গেয়ে ওঠেন তাঁর কথার।

• • • • • • •

গোবরধনের জোর ধোলাই খাওয়া

এমন পাল্লায় পড়ে মানুষ !

চিরদিন সহর্ষ দেখেছি, বিগড়োতে দেখিনি কখনো, এমন যে মানুষ তাঁকেও সেদিন বিগড়ে যেতে দেখা গেলো···

সেই যে ডি এল রায়ের হাসির গানে আছে না ?

'রাজা গেলেন···।

দিল্লী কিংবা বম্বে নয়,
মাদ্রাজ কিংবা ব্রহ্মে নয়,
ট্রেনে নয় প্লেনে নয়,
রেল কী ষ্টীমার চেপে
রাজা গেলেন ক্ষেপে।'

অনেকটা সেই রকমেরই ব্যাপার হলো যেন !

জীবনে হাজার মানুষের হাজারো রকমের পাল্লা কাটিয়ে এসে শেষটায় কিনা সামান্য এক জানলার পাল্লায় পড়লেন হর্ষবর্ধন !

আর সেই এক পাল্লাতেই তাঁর অমন দিলদরিয়া মেজাজ খিচড়ে গেল।

হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন আর আমি তিনজনই দূর পাল্লার যাত্রী। একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরার তিনটে বার্থ রিজার্ভ করে পাটনা যাচ্ছি আমরা। সন্ধেয় চেপেছি হাওড়ায়, সকালে পৌছাবো পাটনা স্টেশনে।

ওপরের দুটো বার্থে গোবরা আর আমি। তলাকার একটা বার্থে হর্ষবর্ধন ! তলার অপর বার্থটায় ছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক, কোথায় যাচ্ছেন কে জানে !

হর্ষবর্ধন পাটনায় তাঁর কারখানার কাঠের কারবারের একটা শাখা খুলতে যাচ্ছিলেন. আমাকে এসে ধরলেন—'চলুন! আপনি আমার দোকানের দ্বার উদ্ঘাটন করবেন।'

'আমি কেন? ও-সব কাজ তো মন্ত্রীরাই করেন মশাই! পাটনায় কি কোন মন্ত্রী পাওয়া যায় না? আমি একটু অবাক হই, 'কেন, সেখানে কি মন্ত্রীর পাট নেই?'

সত্যি বলতে, এ-সব কাণ্ড-কারখানার মধ্যে যেতে আদৌ আমার উৎসাহ হয় না। উদ্ঘাটন, উন্মোচন, ফিতে-কাটা এগুলোকে আমি মন্ত্রীদের অভিনয়ের পার্ট বলেই জানি।

'থাকবে না কেন?' বললেন তিনি, 'তবে তাদের কারো সঙ্গে আমার তেমন দহরম নেই—একদম নেই।'

একদমে কথাটা শেষ করে নবোদ্যমে তিনি পরের খবরটি জানালেন। 'তাছাড়া, জানেন কি মশাই...', দাদার কথায় বাধা দিয়ে গোবর্ধন ফোড়ন কাটল মাঝখান থেকে—'তাছাড়া, আপনিই বা মন্ত্রীর চেয়ে কম কিসে বলুন? দাদার মুখ্যমন্ত্রী আপনিই তো! দাদাকে যত কুমন্ত্রণা আপনি ছাড়া কে দেয় আর?'

'তাছাড়া, আরেকটা কথা', হর্ষবর্ধন তাঁর কথাটা শেষ করেন —'কলকাতায় তো এখন ছানা কনট্রোল হয়ে মিষ্টি-ফিষ্টি একেবারে নেই! এখানকার কারিগররা গেছে কোথায় জানেন? সবাই সেই পাটনায় গিয়ে সন্দেশ বানাচ্ছে! কলকাতার মেঠাই সব সেখানে। নতুন গুড়ের সন্দেশ যদি খেতে চান তো চলুন পাটনায়।'

নতুন গুড়ের এই নিগূঢ় সন্দেশ লাভের পর পাটনায় যাবার আর কোন বাধা রইল না তারপর।

বম্বে এক্সপ্রেস অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঘটাংঘটের ঘটঘটা তুলে ছুটে চলছিলো...

তলার সেই অপর বার্থটির ভদ্রলোক উঠে জানলার পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন হঠাৎ।

হর্ষবর্ধন বললেন, 'একি হলো মশাই! জানালাটা বন্ধ করলেন কেন? মুক্ত বাতাস আসছিল বেশ।'

'ঠাণ্ডা আসছে কিনা।' বললেন সেই ভদ্রলোক।

'ঠাণ্ডা!' ওপরের বার্থ থেকেই যেন ধপাস করে পড়লেন হর্ষবর্ধন, তাঁর নিচেকার বার্থে শুয়ে থেকেই।—'ঠাণ্ডা এখন কোথায় মশাই! সবে এই অঘ্রাণ মাস! শীত পড়েছে নাকি এখনই?' উঠে জানলার পাল্লাটা তুলে দিয়ে প্রাণভরে যেন তিনি অঘ্রাণের ঘ্রাণ নিলেন —'আহা! কী মিষ্টি হাওয়া।'

'রীতিমতন হাড় কাঁপানো হাওয়া মশাই।' জবাব দিলেন সেই ভদ্রলোক। তারপরই জানালাটা ফের নামিয়ে দিলেন তক্ষুনি।

'হাড় কাঁপানো হাওয়া! দেখছেন না, আমি ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছি!' বলে হর্ষবর্ধন জানালাটা তুলে দিলেন আবার!

'ফিনফিনে তো দেখছি ওপরে। কিন্তু তার তলায়?' শুধোলেন সেই অচেনা লোকটি, ফিনফিনের তলায় তো বেশ পুরু কোট এঁটেছেন একখানা, তার তলায় আবার একটা অলেষ্টারও দেখছি...'

'আজ্ঞে'—এবার আমাকেই প্রতিবাদ জানাতে হয়, 'আজ্ঞে ওটা ওঁর কোট নয়, গায়ের মাংস! বেশ মাংসল দেহ দেখছেন না ওঁর? আর যেটাকে আপনি অলেষ্টার বলে ভ্রম করছেন সেটা আসলে ওঁর ভুঁড়ি...।'

'ওই হলো মাংসের কোটিং তো, তা, সেটা কোটের চেয়ে কম না কি? ওতেও গা বেশ গরম থাকে। কোটের মতই গরম রাখে গা। হাড়ে তো ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে পায় না। আমার এই হাড় জিরজিরে শরীরে অলেষ্টার চাপিয়েও ঠাণ্ডায় শিরশির করছে হাত পা।' বলতে বলতে সত্যিই যেন তিনি শিহরিত হতে লাগলেন শীতে। 'তারপর আমার মাফলারটাও আনতে ভুলে গেছি আবার! আমার টনসিলের দোষ আছে জানেন? গলায় যদি একটু ঠাণ্ডা লাগে তো

আর রক্ষে নেই।'

'মুক্ত বাতাস দারুণ স্বাস্থ্যকর। তাতে কখনো টনসিল বাড়ে না।' হর্ষবর্ধন জানান—'বাড়তে পারে না।' বলে পাল্লাটা গম্ভীর-ভাবে তুলে দেন আবার।

'আপনার বাড়ে না। কিন্তু আমার বাড়ে। আপনার কি, গলায় তো বেশ মোটা একটা কমফর্টার জড়িয়ে রয়েছেন!'

'আমার গলায় কমফর্টার?' হর্ষবর্ধন উর্ধ্বনেত্রে আমাকেই যেন সাক্ষী মানতে চান।

'না মশাই' গলায় ওঁর কোনো কমফর্টার নেই।' বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমায়।—'আপনার টনসিলের দোষ বলছেন, কিন্তু চোখেরও বেশ একটু দোষ আছে দেখছি। ওঁর গলায় পুরুমতন ওটা যা দেখছেন, ওকে কী বলা যায় আমি জানিনে। গরুর হলে গলকম্বল বলা যেত, কিন্তু ওঁকে তো গোরু বলা যায় না—,' বলে হর্ষবর্ধনকে একটু কমফর্ট দিই। 'ওঁর ক্ষেত্রে ওটাকে গলার ভুঁড়িই বলতে হয় বাধ্য হয়ে, কিংবা ভুরি ভুরি গলাও বলতে পারেন।'

'গলায় কেউ কম্বল জড়ায় নাকি? হর্ষবর্ধন আমার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি হানেন এবার—'গরুরাই গলায় কম্বল জড়ায়।'

'সেই কথাই তো বলেছি আমি।' কৈফিয়তের সুরে জানাই, 'গরুর হলে ওটা গলকম্বল হত। আপনার বেলা তা নয়। তাই তো আমি বলছিলাম ওনাকে।'

'আপনার টনসিল ঢাকা একটা কিছু রয়েছে তো তবু।' বলে ভদ্রলোক উঠে জানলার পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন আবার—'যাক, আমি কোন তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। নিজে সতর্ক থাকতে চাই।'

হর্ষবর্ধন উঠে তুলে দিলেন পাল্লাটা—'গরমে আমার দম আটকে আসে। বন্ধ হাওয়ায় স্বাস্থ্য খারাপ হয়। চারদিক বন্ধ করে দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমি মোটেই থাকতে পারিনে।'

'আপনি কি আমাকে খুন করতে চান নাকি?' ভদ্রলোক উঠে

খুলে ফেললেন ফের পাল্লা—'ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দি থেকে কাশি, কাশি থেকে গয়া—আই মীন ; টাইফয়েড, তার থেকে নিমোনিয়া···!'

'তার থেকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।' ওপরের বার্থ থেকে জুড়ে দেয় গোবর্ধন। ব্যঙ্গের সুরেই বলতে কি !

'তাই হোক আমার। তাই আপনি চান নাকি ? আপনি তো বেশ লোক মশাই! বলে তিনি পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন জানালার।'

'আর ,আপনি কী চান শুনি ? দূষিত বদ্ধ আবহাওয়ায় আমার হেঁচকি উঠুক, হাঁপানি হোক, যক্ষ্মা হোক, টি-বি হোক, ক্যানসার হোক, নাড়ি ছেড়ে যাক, দম আটকে মারা যাই আমি, তাই আপনি চান নাকি ?'

হর্ষবর্ধন উঠে পাল্লাটা তোলেন আবার।

এই ভাবে চলল দুজনের···পালা করে—পাল্লা তোলা আর নামানো · পাল্লা দিয়ে চলল দু-জনার। করতে করতে এসে পড়ল খড়্গাপুর।

বম্বে এক্সপ্রেস সেখানে থামতেই হর্ষবর্ধন তেড়ে-ফুঁড়ে নামলেন কামরার থেকে—'যাচ্ছি আমি গার্ড সাহেবের কাছে। আপনার নামে কমপ্লেন করতে চললাম।'

'আমিও যাচ্ছি।' তিনিও নামলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আমিও নামলাম ওঁদের পিছু পিছু। কেবল গোবরা রইল কামরায় মালপত্র সামলাতে।

গার্ড সাহেব দু-পক্ষেরই অভিযোগ শোনেন। শুনে মাথা নাড়েন গম্ভীরভাবে—'এতো ভারী মুস্কিল ব্যাপার দেখছি। শার্সি তুললে আপনার স্বাস্থ্যহানি হয়, আর শার্সি নামালে আপনার ? তাই তো ? ভারি মুস্কিল তো। চলুন দেখিগে ·।'

'কোন কামরাটা বলুন তো আপনাদের ? ··, বলতে বলতে তিনি এগোন 'ঐ ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা বলছেন ? জানালাটা এখন বদ্ধ

রয়েছে, না, খোলা আছে?'

'আমি নামিয়ে দিয়ে এসেছি পাল্লাটা' সেই ভদ্রলোক জানান।

'ওটার শার্সিটা তো ভাঙা বলেই জানতাম, ওর পাল্লার কাচটা তো বসানো হয়নি এখনো যতদূর আমার মনে পড়ে। আপনি বলছেন কাচের পাল্লাটা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন? কিন্তু কে যেন মুখ বাড়াচ্ছে না। জানালা দিয়ে?

'আমার ভাই গোবর্ধন। হর্ষবর্ধন জানান!

'পাল্লার কাচটা ভাঙাই রয়েছে তাহলে। নইলে ছেলেটা শার্সির ভেতর দিয়ে মুখ বাড়ায় কি করে? যান, যান উঠে পড়ুন চট করে। এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে···টাইম ইজ আপ···।'

বলতে বলতে গার্ড-সাহেবের নিশান নড়ে, গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে। আর হর্ষবর্ধন কামরায় এসে গোবরাকে নিয়ে পড়েন।

'তোর কি সব তাতে মাথা না গলালে চলে না? কি আক্কেল তোর বল দেখি? কে বলেছিল তোকে কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে মাথা গলাতে? কে বলেছিল—কে?' সমস্ত চোটটা তার ওপরেই গিয়ে পড়ে তখন। এমন তিনি বিগড়ে যান যে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন গোবরাকে।

'কাচের ভেতর দিয়ে মাথা গলানো। সত্যি, এমন কাঁচা কাজ করে মানুষ।' আমিও গোবরাকে না দুষে পারি না।

———

● ● ● ● ● ● ●

গোবরধন ও হর্ষবর্ধনের বাঘ শিকার

হর্ষবর্ধনকে আর রোখা গেল না তারপর কিছুতেই ! বাঘ মারবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

'আরেকটু হলেই তো মেরেছিল আমায়।' তিনি বললেন, 'ওই হতভাগা বাঘকে আমি সহজে ছাড়ছি না।'

'কি করবে দাদা তুমি বাঘ নিয়ে ? পুষবে নাকি ?'

'মারবো ওকে। আমাকে মেরেছে আর ওকে আমি রেহাই দেব তুই ভেবেছিস ?'

'তোমাকে আর মারল কোথায় ? মারতে পারল কই ?'

একটুর জন্যেই বেঁচে গেছি না ? মারলে তোরা বাঁচাতে পারতিস আমায় ?'

গোবর্ধন চুপ করে থাকল, সে কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

'এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে কি !' বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু চুমরে নিলেন—'এই গোঁফের জন্যেই বেঁচে গেছি আজ। নইলে ওই লোকটার মতই হাল হতো আমার···'

মৃতদেহটির দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন—গোঁফ বাদ দিয়ে, বেগোঁফের বকলমে ও তো খোদ আমিই। আমার মতই হুবহু। ও না হয়ে আমিও হতে পারতাম। কি হতো তাহলে বল তো ?'

গোবরা সে-কথারও কোন সদুত্তর দিতে পারে না।

'এই চৌকিদার।' হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'একটা বন্দুক যোগাড় করে দিতে পার আমায় ? যতো টাকা লাগে দেব।'

বন্দুক নিয়ে কি করবেন বাবু ?'

বাঘ শিকার করব আবার কি ? বন্দুক নিয়ে কী করে মানুষ ?'

বলে আমার প্রতি ফিরলেন : 'আমার এই বীরত্ব-কাহিনীটাও লিখতে হবে আপনাকে। যত সব আজেবাজে গল্প লিখেছেন আমাকে নিয়ে। লোকে পড়ে হাসে কেবল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে শুনেছি।'

'তার কি হয়েছে? লিখে দেব আপনার শিকার-কাহিনী। এই বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব আপনার। কিন্তু তার জন্যে বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতে হবে কেন? বনে-বাদাড়েই বা যেতে হবে কেন? বাঘ মারতে এত হ্যাঙ্গামের কী মানে আছে? বন্দুকের কোন দরকার নেই। সাপ-ব্যাঙ একটা হলেই হলো। কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ মারা যায়।'

'মুখেন মারিতং বাঘং?' গোবরা টিপ্পনি কাটে।

'আপনি টাকার কথা বলছেন বাবু!' চৌকিদার এতক্ষণ ধরে কী যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, মুখ খুলল এবার—তা, টাকা দিলে এনে দিতে পারি একটা বন্দুক—দু-দিনের জন্য। আমাদের দারোগা সাহেবের বন্দুকটাই চেয়ে আনতে পারি। বাঘের ভারী উপদ্রব হয়েছে এধারে—মারতে হবে বাঘটাকে—এই বললেই তিনি ওটা ধার দেবেন আমায়। ব্যাভারের পর আবার ফেরত দিয়ে আসব।'

'শুধু বন্দুক নিয়ে কি করব শুনি? ওর সঙ্গে গুলি-কার্তুজ টোটা ইত্যাদি এ-সবও তিনি দেবেন তো? নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় নাকি? তেমনটা করতে গেলে তার আগেই বাঘ আমায় সাবড়ে দেবে?'

'তা কি হয় কখনো? বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ-টার্তুজ দেবেন বইকি বাবু।'

'তাহলে যাও, নিয়ে এসো গে চটপট। বেশি দেরি কোর না। বাঘ না-মেরে নড়ছি না আমি এখান থেকে জলগ্রহণ করব না আজ।'

'না না, বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার টাবার নিয়ে এসো ভাই।'

আমি বাতলাই : 'খালি পেটে কি বাঘ মারা যায় ? আর কিছু না হোক, একটু গাঁজা খেতে হবে অন্তত।'

'আনব নাকি গাঁজা ?' সে শুধোয়।

'গাঁজা হলে তো বন্দুকের দরকার হয় না। বনে-বাদাড়েও ঘুরে মরতে হয় না। বন্দুকের বোঝা বইবারও কোন প্রয়োজন করে না। ঘরে বসেই বাঘ মারা যায় বেশ।' আমি জানাই।

'না না গাঁজা-ফাঁজা চাই না। বাবু ইয়ার্কি করছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু রুটি মাখন বিস্কুট চকোলেট—এইসব এনো, পাও যদি।' গোবরা বলে দেয়।

বন্দুক এনে হর্ষবর্ধন আমায় শুধাল—'কি করে বাঘ মারতে হয় আপনি জানেন ?'

'বাগে পেলেই মারা যায়। কিন্তু বাগেই পাওয়া যায় না ওদের। বাগে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উলটে নাকি বাঘেই পায়।

'বনের ভিতরে সেঁধুতে হবে বাবু।' চৌকিদার জানায়।

গভীর বনের ভেতরে পা বাড়াতে প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোন বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চাও না —আস্ত একটা কোলা ব্যাঙ।

ব্যাঙ দেখে হর্ষবর্ধন ভারী খুশি হলেন, বললেন, 'এটা শুভ লক্ষণ। ব্যাঙ ভারী পয়া, জানিস গোবরা ?

'মা লক্ষ্মীর বাহন বুঝি ?'

'সে তো প্যাঁচা।' দাদা জানান—'কে না জানে !'

'যা বলেছেন।' আমি ওঁর কথায় সায় দিই 'যতো প্যাঁচাল লোকই হচ্ছে মা লক্ষ্মীর বাহন। প্যাঁচ কষে টাকা উপায় করতে হয়, জান না ভাই ?'

'তাহলে ব্যাঙ বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশের···না, না···'বলে গোবরা নিজেই শুধরে নেয়—'সে তো হলো গে ইঁদুর।'

'আমি পয়া বলেছি কারো বাহন টাহন বলে নয়। আমার নিজের

অভিজ্ঞতায়। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি, তোর মনে নেই গোবরা? ধরমতলায় একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?'

'মনে আছে। পেয়েই তুমি সেটা পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে, পাছে কারো নজরে পড়ে। তারপর বাড়ি এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে—'

'দেখলাম যে চারটে ঠ্যাং। মনিব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে? তার পর ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি কি, ওমা, ট্রামগাড়ির চাকার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ব্যাঙ একটা।'

'আর কিছুতেই খোলা গেল না ব্যাগটা।'

'গেল না বটে, কিন্তু তার পর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল। কাঠের কারবারে ফেঁপে উঠলাম আমরা। আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাই না তারপর।

'ব্যাঙ তাহলে বিশ্বকর্মার বাহন হবে নির্ঘাত।' গোবরা ধারণা করে যত কারবার আর কারখানার কর্তা ঐ ঠাকুরটি তো। কী বলেন মশাই আপনি? ব্যাঙ বিশ্বকর্মার বাহনই তো বটে?

'ব্যাঙ না হলেও ব্যাঙ্ক তো বটেই। বিশ্বের কর্মীদের সহায়ই হচ্ছে ঐ ব্যাঙ্ক। আর বিশ্বকর্মাদের বাহন বোধহয় ওই ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক।'

'ব্যাঙ থেকেই ব্যাংক। একই কথা।' হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হন। —'ব্যাঙ থেকেও আমার আমদানি, আবার ব্যাঙ্ক থেকেও।'

'ব্যাঙটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়ল।' আমি বলি— 'জামপিং ফ্রগের গল্প। মার্ক টোয়েনের লেখা। ছোটবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা।'

'মার্ক টোয়েন মানে? হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

'এক লেখকের নাম। মার্কিন মুলুকের লেখক।'

'আর জামপিং ফ্রগ?' গোবরার জিজ্ঞাস্য।

'জামপিং মানে লাফান, আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাঙ। মানে যে

ব্যাঙ কিনা লাফায়।

'লফিং ফ্রগ বলুন তাহলে মশাই।'

'তাও বলা যায়। গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন। তবে ব্যাঙের ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না। গল্পটা শুনুন এবার। মার্ক টোয়েনের সময়ে সেখানে, ঘোড়দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাঙের দৌড় হোত। লাফিয়ে লাফিয়ে যে ব্যাঙ যার ব্যাঙ আর সব ব্যাঙকে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি। সেইজন্যে করত কি, অন্য সব ব্যাঙকে হারাবার মতলব যাতে তারা তেমন লাফাতে না পারে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো—সেইজন্য সবার আড়ালে এক একটাকে ধরে পাথর কুঁচি খাইয়ে বেশ ভারি করে দিত কেউ কেউ।'

'খেত ব্যাঙ সেই পাথর কুঁচি?'

'অবোধ বালক তো! যাহা পায় তাহাই খায়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।

'পরীক্ষা করে দেখলেই হয়।' গোবরা বলে: 'এই তো পাওয়া গেছে একটা ব্যাঙ—এখন বাজিয়ে দেখা যাক না খায় কি না।'

গোবরা কতকগুলো পাথর কুঁচি যোগাড় করে এনে গেলাতে বসল ব্যাঙটাকে। হাঁ করিয়ে ওর মুখের কাছে কুঁচি ধরে দিতেই কি আশ্চর্য, তক্ষুনি সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল। একটার পর একটা গিলতে লাগল টুপটাপ করে। অনেকগুলো গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট। তারপর মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাঙটা। ভারিক্কি দেহ নিয়ে লাফান দূরে থাক, নড়া চড়ার কোন শক্তি রইল না তার আর।

'খেলতো বটে, খাওয়ালিও তো দেখলাম, ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয়।' দাদা বললেন।

'খুব হজম হবে। ওর বয়সে কত পাথর হজম করেছি দাদা।' গোবরা বলে: 'ভাতের সঙ্গে এতদিনে যতো কাঁকর গিলেছি, ছোট-

খাট একটা পাহাড়ই চলে গেছে আমাদের গর্তে। হয়নি হজম?'

'আলবৎ হয়েছে।' আমি বলি: 'হজম না হলে তো যম এসে জমত।'

'ওই গ্যাখ দাদা!' আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে গোবরা।

আমরা দেখি। প্রকাণ্ড একটা সাপ, গোখরোই হবে হয়ত, এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চৌকিদার বলে—'একটুও নড়বেন না বাবুরা। নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে। আপনাদের দিকে নয়, ব্যাঙটাকে নিতে আসছে ও।'

আমরা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলাম, তা বটে। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে ব্যাঙটাকে এসে আত্মসাৎ করল।

সাপটা এগিয়ে এসে ধরলে ব্যাঙটাকে, তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে মুখের ভেতর পুরে ফেলল। তারপর গিলতে লাগলো আস্তে আস্তে।

আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধঃকরণ-লীলা দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে পুরুষ্টু ব্যাঙটা তার তলার দিকে চলতে লাগল, খানিকটা গিয়ে থেমে গেল এক জায়গায়, সেইখানেই আটকে রইল, তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক না, সেটাকে আর নামাতে পারল না। পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাঙটা তার পিঠের উপর কুঁজের মত উঁচু হয়ে রইল।

উটকো ব্যাঙটাকে গিলে সাপটা উট হয়ে গেল যেন শেষটায়। তার মুখখানা যেন কেমনতর হয়ে গেল। খুব তীব্র বৈরাগ্য হলেই যেমনটা হয়ত দেখা যায়। ভ্যাবাচ্যাকা মার্কা মুখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জবুথবু নট-নড়ন-চড়ন সে পড়ে রইল সেইখানেই।

তারপর তার আর কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

'ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার বুঝলে দাদা? সাপের পেটে ব্যাঙ, আর ব্যাঙের পেটে যতো পাথর কুঁচি। আগে ব্যাঙ পাথর কুঁচিগুলো হজম করবে, তারপরে সে হজম করবে গিয়ে বাঙটাকে। সে বোধহয় আর ওদের এজন্মে নয়।

'ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক।' আমি তখন বলি, ততক্ষণে আমাদেরও কিছু হজম হয়ে যাক। আমরাও খেতে বসি এধারে।'

চৌকিদারের আনা মাখন-রুটি ইত্যাদি খবর-কাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম আমরা। সাপটার অদূরেই বসা গেল। সাপটা মার্বেলের গুলির মতন তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই।

এমন সময়ে জঙ্গলের ওধারে একটা খসখসানি আওয়াজ পাওয়া গেল। 'বাঘ এসে গেছে বাবু!' চৌকিদার বলে উঠল, শুনেই না আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঘটা আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

'রুটি মাখন-টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি।' দেখে আমি দুঃখ করলাম।

'কি করে যাবে? আমরা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছি না সব, ওর জন্যে রেখেছি নাকি? বলল গোবরা পাঁউরুটির শেষ চিলতেটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

'যেমন করে পাথর কুচিগুলো সাপের পেটে গেছে ঠিক সেই ভাবে।' আমি বিশদ করি।

'এক গুলিতে সাবাড় করে দিচ্ছি না ব্যাটাকে। দাঁড়ান না।' বলে হর্ষবর্ধন হাতে কী একটা তুললেন, 'ওমা! এটা যে সাপটা।' বলেই কিন্তু আঁতকে উঠলেন—'বন্দুকটা গেল কোথায়?'

'বন্দুক আমার হাতে বাবু!' বলল চৌকিদার : আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্দুক। তখন থেকেই আমার হাতে আছে।'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান?'

'না বাবু, তবে তার দরকার হবে না। বাঘটা এগিয়ে এলে এ বন্দুকের কুঁদার ঘায় ওর জান খতম করে দেব। আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতের সাপটাকেই তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে।

সাপটা সবেগে পড়েছে গিয়ে তার উপর।

কিন্তু তার আগেই না, কয়েক চক্করের পাক খেয়ে, সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাঙটা আর ব্যাঙের গর্ত থেকে যতো পাথর কুচি তীর বেগে বেরিয়ে—ছররার মতই বেরিয়ে লেগেছে গিয়ে বাঘটার গায়—তার চোখে মুখে নাকে।

হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিরমি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর তার নড়া চড়া নেই।

'সর্পাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা?' আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগুলাম।

চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদায় বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল। দিয়ে বললো—'আপনার সাপের মারেই মারা পড়েছে বাঘটা। তাহলেও সাবধানের মার নেই বাবু, তাই বন্দুকটাও—মারলাম তার ওপর।'

'এবার কি করা যাবে?' আমি শুধাইঃ 'কোন ফোটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফোটো তোলা যেত একখানা।'

'এখানে ফোটো-ওলা কোথায় বাবু এই জঙ্গলে? বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেব দারোগাবাবুকে। তাহলে আমার ইনামও মিলবে—আবার চৌকিদার থেকে একচোটে দফাদার হয়ে যাব আমি—এই বাঘ মারার দরুন। বুঝলেন?'

'দাদা করল বাঘের দফারফা আর তুমি হলে গিয়ে দফাদার।' গোবরা বলল—'বারে!'

'সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ শিকার করলেন আপনি দেখছি!' আমি বাহবা দিলাম ওর দাদাকে।

● ● ● ● ● ● ●

কল্কে-কাশির কাণ্ড

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই গোমড়া মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ। তার জন্যে আবার কল্‌কে-কাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া। হোন না গে তিনি নামজাদা এক ডিটেকটিভ (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে এই কল্‌কে-কাশির ন্যায় এত বড় গোয়েন্দা নাকি আর নেই)! তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অমন ভারি কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্লর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সত্যি, কামস্কাটকা থেকে উনি না এলেও এমন কিছু আটকাত না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোণের টেবিলে কল্‌কে-কাশির মুখোমুখি বসে গুম হয়ে এইসব কথাই ভাবছিল প্রফুল্ল। সামনে চপ-কাটলেট-ডিভিল-ডিম-কেক-পুডিং-এর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না! বাস্তবিক, এই মূর্তিমান কোরিয়ার সম্মুখে কি করিয়া কিছু মুখে তোলার উৎসাহ হয়? এত বড় অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে? প্রফুল্ল তাই বিষন্ন।

কিন্তু মিঃ কল্‌কে-কাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাঁটা চামচের কামাই নেই তার। এক ফাঁকে সামনের যুবকটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। একি! কল্‌কে-কাশি একটু বিস্মিতই হন। একজন খুনে একটার পর একটা খুন করেছে, নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিক বার তিনি দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেন নি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ দশটা প্লেটের সামনে একদম নির্বিকার! একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথটি হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-স্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড তাঁর স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে! কল্‌কে-কাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুল আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়) অকস্মাৎ থেমে যায়; মাছের চোখের মতন ড্যাবডেবে চোখ প্রসারিত হয় ঈষৎ। তিনি প্রশ্ন করেন, 'প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে, জানতে পারি-কি?'

বাংলাতেই প্রশ্ন করেন। সোজা পরিষ্কার বাংলাতেই। কামস্কাটকার লোক হলে কী হবে! বাংলা, হিন্দি, উড়ে (এবং কোন-কোন জানোয়ারের ভাষাও) কল্‌কে-কাশির ভালভাবেই আয়ত্ত। তবে কামস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার সাহস তার নেই। কেননা সে নিজেও কামস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ অজ্ঞই।

প্রফুল্ল আরও বেশি গম্ভীর হয়ে যায়; মাথা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দেয়, 'ভাবনায় মশাই, ভাবনায়! কীরকম গুরুদায়িত্ব মাথার ওপরে, বুঝতেই তো পারছেন।'

'বুঝতে পারছি বইকি।' কল্‌কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'মিস্টার ব্যানার্জির কবে এসে ভারতবর্ষে পেঁছিবার কথা! অথচ তিনি কি-এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেছেন। আসতে পারলেন না। আর তাঁর সই করা নমিনেশন-পেপার এয়ার মেলে কাল বিকেলে বোম্বে পেঁীছেছে; তাঁর অ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানির আপিসের জিম্মায় আছে। সেই নমিনেশন-পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ছুটতে হবে আমাদের। তবে আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার যথাস্থলে ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিং-এর শেষ দিন। তা না হলে মিস্টার ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হলো না।'

'বিলেতে মিস্টার ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোনও রহস্যজনক কারণ আছে বলে আপনি আশঙ্কা করেন!' প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করে।

কল্‌কে-কাশি এর জবাব দেন না। 'এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোন কারণে একদিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা লেট হলেই সব কিছু পণ্ড—তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।'

'মারা যাবার?' প্রফুল্লর চোখ প্রকাণ্ড হয়, 'কেন, নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ওটা কি একটা মার্তব্য জিনিস?'

'হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমন কি রেজিস্ট্রি করে ইনসিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথ জিনিসটা পৌঁছবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞেস করছেন? বাংলাদেশে দুটি দল আছে জানেন আপনি?'

'উঁহু', প্রফুল্ল বলে, 'জানি না তো!'

'এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে চায়। দু দলে ভয়ানক রেষারেষি। কাউন্সিলে যে-দলে ভারি হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা! একটি দলের নাম হচ্ছে ফ্লু-ফ্লুকস ফ্যান; যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে, আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায় তারাই মিলে এই দল গড়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত কু-ক্লুকস-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই, একমাত্র নামের কতকটা শামিল ছাড়া।'

'বটে?' প্রফুল্লর নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না!—'আরেকটা দল কারা?'

'মিস্টার ব্যানার্জী হচ্ছেন এই 'ফ্লু-ফ্লুকস-ফ্যানে'র পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে 'বাই হুক আর ক্রুক'! এই বাই হুক আর ক্রুক-পার্টির নেতা হচ্ছেন মিস্টার সরকার। যেমন করেই হোক নিজের মতলব হাসিল করতে এঁরা সিদ্ধহস্ত!'

'আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারি চালে মিস্টার ব্যানার্জী বিলেতে আটকা পড়েছেন?'

আপাতত আমি ঐ কোণের লোকটার দিকে তোমার দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।' কল্‌কে-কাশি চোখ টিপে ইশারা করেন।

এতক্ষণে কল্‌কে-কাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক কিছু খবর রাখেন তো ভদ্রলোক! এই-জন্যে তাঁর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না। কল্‌কে-কাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে তাকায়।

'ঐ যে—ঐ কাটখোট্টা গোছের চেহারা, মাথার চুল ক্রপ-করা, চোখে কুটিল ভঙ্গি, ঐ কোণের ছোট্ট টেবিলটায় বসে কাটলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, ওকে লক্ষ্য কর। সহজেই বুঝতে পারবে, এরকম ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁয় গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়, কাঁটা চামচের কসরতে এখনো পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপক্ক। ও এখানে এসেছে তোমার অনুসরণ করে।'

'আমার?' প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, 'তার মানে?'

'একটু কায়দা করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, চোখ কাটলেটের দিকে থাকলেও ঝোঁক ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চীজ উনি—ওর মতন কৌশলী আর ভয়লেশহীন ভদ্রবেশী গুণ্ডা দুটি আছে কিনা সন্দেহ। ওই শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এদেশে দুর্লভ। মিস্টার ব্যানার্জীব পার্টি আমাকে যে তোমরে সঙ্গে দিয়েছেন, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কাবণ।

প্রফুল্লর সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে 'ওর নাম?'

'ওর নাম হচ্ছে সমাদ্দার, ওরফে সমরেশ ঠাকুর, ওরফে গোপাল হাজরা, ওরফে নটেশ্বর রায়, ওরফে পোড়া গণেশ, ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ির ফেরত। আমার সঙ্গে ওর অনেকদিনের পরিচয়,—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বন্ধই বলতে পার। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু সংকোচ বোধ

করছে, নইলে এতক্ষণে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।

প্রফুল্ল চমকে ওঠে, 'বলেন কি মশাই ?'

'ওই রকমই।' কল্‌কে-কাশি যৎসামান্যই হাসেন। 'সরকারের দল ওকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ব্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথাসময়ের আগে যথাস্থানে যাতে পৌঁছুতে না পার সেই-জন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও ও পেছপা হবে না। তবে কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেই ও ভালবাসে—খুনোখুনি করার ততটা পক্ষপাতী নয়। এ বিষয়ে একটু সুরুচিই আছে বলতে হয় লোকটার!'

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না, 'আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন না তাহলে ? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এক্ষুনি—এই দণ্ডে।'

'দণ্ডমুণ্ডের মালিক কি আমি ? তাছাড়া, এখন পর্যন্ত ও কোন অপরাধ করেনি, কেবল মনের মধ্যে এঁচেছে মাত্র ; আর মনে-আঁচার জন্যেই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয় তাহলে অ্যাতো লোককে ধরতে হয় যে জেলখানায় তার জায়গা কুলোবে কিনা সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না।'

'তাহলে, তাহলে তো ভারি মুশকিল!' প্রফুল্ল ভীতই হয়, বলে, 'আমাকে খুন করে ফেলবে তবে ?'

'যদি করেই ফেলে, তখন—হ্যাঁ, তখন ওকে ধরে ফেলতে আমার বিলম্ব হবে না, যদি নিতান্তই না পালিয়ে যায়। তবে, সমাদ্দারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতারই সম্পর্ক। আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তোমাকে একেবারে খতম করবে না আমি আশা করি। এত ভয় কিসের তোমার ?'

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল!

'এইজন্যেই বলেছিলাম ভয়ানক গুরুদায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে কলকাতায় না পৌঁছতে পারো তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পার্টিরও দফা রফা। মিঃ সরকারের দলেরই

একচ্ছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একখানা সই করা কাগজের ওপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ছাখো। এবং, যে-সে পার্টির নয়, ফ্লু-ফ্লুকস-ক্যান!'

'অর্থাৎ আপনার ভাষায় যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই, বিন্দুবিসর্গও জানি না, আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে?' প্রফুল্ল বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে না।

'তার মানে, তুমি যে-আপিসের কেরানি তার বড়কর্তা ঐ দলের একজন হোমরা-চোমরা! তিনি তো ক্যানের হাওয়া খান, তাহলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, নাড়িজ্ঞানওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুস খেয়ে—বুঝতেই পারছ! তাছাড়া, ওদের বিশ্বাস আছে তোমার ওপর। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপরে দেওয়ায় তার প্রমাণ হয় না কি?'

'আমার গায়েও যথেষ্ট জোর!' প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল্ কণ্ট্রোল করে কল্‌কে-কাশিকে দেখায়, 'সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা প্রাণ থাকতে নয়!'

'এস, সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই'—কল্‌কে-কাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, 'কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে তাই ভেবে কাহিল হয়ে উঠেছে বেচারা!

'ওর সঙ্গে আলাপ?' দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, 'বলেন কি আপনি?'

'ক্ষতি কী তাতে? গিলে ফেলবে না তোমায়। কল্‌কে-কাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, 'এই যে সমাদ্দার! অনেক দিন পরে দেখা, কেমন, ভাল আছ তো বেশ?

সমাদ্দার চমকে ওঠে, 'মিষ্টার কল্‌কে-কাশি যে! এখানে এখন আপনাকে দেখতে পাব আমি আশা করিনি।'

'আমি কিন্তু আশা করেছিলুম, পরশু সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে একই বোম্বে মেলে যখন উঠতে দেখলাম তোমাকে।'

বটে?' সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, আপনারাও তাহলে আজ সকালেই বোম্বে এসে পৌঁছেছেন! উনি আপনার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ এই একটু আগে নেমেই এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে—হ্যাঁ কী জিজ্ঞেস করছিলে? ইনি? ইনি হচ্ছেন প্রফুল্লকুমার রায়, কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালমতই জানা আছে ভাই সমাদ্দার!'

'আমার?' সমাদ্দার থতমত খায়, না তো! আমি কি করে জানব? তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব অবশ্যই।'

'তা তো হবেই। হবার কথাই। বেশ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু আর ইনি হচ্ছেন সমাদ্দার আমার বন্ধু। অন্তত আমার শত্রু নন। এঁর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি।

প্রফুল্ল এবং সমাদ্দার বোকার মতো পরস্পরকে প্রতিনমস্কার করে। 'সুখী হলাম, প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে!' সমাদ্দার জানাল।

'হবেই তো।' কল্‌কে-কাশি যোগ করেন, নিশ্চয়! এইজন্যেই কি কলকাতা থেকে এতটা পথ কষ্ট করে তোমাকে আসতে হয়নি? বলো! ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনই পেছপা নই বলেই তোমাদের আলাপ করিয়ে দিলাম।'

'সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ কল্‌কে-কাশি! সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, 'কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলছ?' 'আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

'সত্যি, আপনার কথার কিছু আমি বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্ম ষ্টুডিওয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।'

'তাই নাকি? তবুও তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য

কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্লবাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির অফিসে, সেখানে তাঁর কী যেন কাজ আছে। আমি অবশ্য ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরি খবর, আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপর, আজ রাত্রের গাড়িতেই আমরা ফিরছি কলকাতায়। আচ্ছা, এখন আসা যাক, হোটেলেই আমাদের আমাদের আবার সাক্ষাৎ আশা করি?'

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বেরিয়ে আসি।' প্রফুল্ল অসন্তোস প্রকাশ করে, 'মিস্টার কল্‌কে-কাশি! আপনি একজন বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—'

'উঁহু উঁহু! আদৌ না!

'কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত সংবাদ ওকে দিয়ে দিলেন না!'

'কাকে? সমাদ্দারকে?' কল্‌কে-কাশি অবাক হন, কী রকম?

'এই—আমার গলষ্টোন অফিসে যাবার খবর? এবং তাজমহল হোটেলে আমাদের ওঠার কথা? তারপর আজ রাত্রের কলকাতা মেলে ফেরা—'

'কেন, কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট লাঘব হয়ে গেল! বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।'

'সেটা কি ভাল হল খুব?' প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

'আহা, বুঝতে পারছ না? যতই ওকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর, যতই ও ভাবতে পাবে ততই নিজের কাজ মাটি করবে, সব ওর গুবলেট হয়ে যাবে, তা জান?'

অতঃপর প্রফুল্ল কল্‌কে-কাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। একটু পরেই আরেক খানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেই এই ট্যাক্সি সমাদ্দারেব। পরমুহূর্তেই আরো একখানা গাড়ি দূর থেকে দু-জনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কল্‌কে-কাশি মহাশয়।

তিনখানি গাড়িই অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির

হয়! চারধারে বাগান ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলস্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভেতরে ঢোকে। একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কল্‌কে-কাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

'সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি! কল্‌কে-কাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিটিও লক্ষ্য করবার।

'এই, একটু শহর দেখতেই বেরিয়েছি।' সমাদ্দার থতমত খায়, 'হাওয়া খেতেও বটে!'

'শহর দেখতে শহরের বাইরে? মন্দ নয়! ফিলম অভিনেতার কাজটা তোমার পাকা তাহলে? কল্‌কে-কাশি গলা পরিষ্কার করেন, 'আমিও তাই-ই আঁচ করছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর এলাম। যাক, আমার কাজ আছে। শহরেই ফিরলাম আমি।' তারপর একটু থামেন হ্যাঁ, হয়ত তোমার জানাই আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভাল! ঐ বাড়িটাই মিঃ গলস্টোনের—ব্যানার্জির নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। ছাখো চেষ্টা করে— যদি তোমার বরাত খুলে যায়! বন্ধু-বান্ধবের ভাল চাওয়াই আমার দস্তুর, জানোই তো!'

কল্‌কে কাশি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেন। যে পথে এসেছিলেন সেইদিকেই ফিরে চলেন। সমাদ্দার কোন জবাব দিতে পারে না।

তারপরেও আরেক ঘণ্টা সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান নিজের তেরো নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। ম্যানেজারের সঙ্গে কিসের যেন বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কল্‌কে-কাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে যায়—'সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ কল্‌কে-কাশি!'

কল্‌কে-কাশি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'কী সর্বনাশ?'

'সমাদ্দার এখানে উঠেছে ! আমাদের পাশের বারো নম্বর ঘরে !'

'তাই নাকি ? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে ! আমি ওর শুভাগমন আশা করেছিলাম ।'

কল্‌কে-কাশি রসিকতা করছেন প্রথমটা প্রফুল্ল তাই ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষু-কর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হল। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর দুশমনে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায় ; শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়ন-তৎপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিক পত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা গ্রন্থমালার বইয়ে পড়ে পড়ে এই রকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা কইতে দেখে তার সে-ধারণা দস্তুরমতই টলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লর মাথায় উঠে গেল, সে মাঝে মাঝে তার কোটের বুকপকেটে হাত দিয়ে গুরুতর বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে-কাগজের টুকরোটির ওপর একটা পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সঙ্গে কোটের ভেতরের লাইনিঙের মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। গলস্টোন সাহেবের সেই বাড়িতে বসেই। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উবে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সাক্ষাৎ সমাদ্দার ওরফে উপেন্দ্রনাথের সমীপে বসে বারবার পরীক্ষার দ্বারা সে নিজেকেই যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হস্তচালনা কল্‌কে-কাশির নজর এড়িয়ে যায় না। তিনি হাসতে থাকেন, 'ভয় নেই প্রফুল্লবাবু, বস্তুটি নিরাপদেই আছে, এবং থাকবেও যদি না নিতান্তই তোমার কোট তুমি খোয়াও।'

কল্‌কে-কাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কল্‌কে-কাশি তা বুঝতে পারেন।

'আমি কি কোন গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি ? মোটেই না, প্রফুল্লবাবু ! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপারটা রেখেছ। কিহে সমাদ্দার, জানতে না ?'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে—'নিশ্চয় ! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো রাখবার জায়গা ! দরকারী জিনিস সকলে ঐখানেই রাখে আর সেটা সকলেই জানে।'

গোয়েন্দা এবং বদমাইস দু-জনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুশড়ে পড়ে। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজ-পত্র রাখবার মামুলি জায়গা এবং তা সকলেই জানে, তবু কী দরকার ছিল মিস্টার কল্‌কে-কাশির সমাদ্দারকে এই খবরটা দেবার ? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরূপ সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সে চেষ্টা করাই কি তাঁর উচিত ছিল না ? কল্‌কে-কাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই !

যাক, প্রফুল্লর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারো ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি, তাহলে বালিশের মতই সেটাকে ব্যবহার করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ঘুম ভারি সজাগ, তার মাথার তলার থেকে কোট সরায় কার সাধ্য ?

খাওয়া শেষ হলে কল্‌কে-কাশি বলেন—'এস সমাদ্দার, একটু দাবা খেলা যাক। প্রফুল্ল, জানো নাকি দাবা খেলা ?

'জানি সামান্যই।' প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

'আমার আপত্তি নেই।' সমাদ্দার উত্তর দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে ওঠে। কল্‌কে-কাশি আর সমাদ্দারের তো ভালই জানা আছে ; প্রফুল্লও নেহাত কম যায় না। ক্রমশই ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয় ! প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ওর গরম বোধ হয়, সে কোট খুলে ফ্যালে, সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর কোন হুঁশই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খোলে এবং প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে, 'প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ

মিস্টার কল্‌কে-কাশির সঙ্গে খেলুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছি কিছু মনে করবেন না!' কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে নিজের কোট কেড়ে নেয়। যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কল্‌কে-কাশি মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাশটাকে এই দণ্ডেই সে টুটি টিপে খুন করেই বসত হয়ত বা!

'প্রফুল্লবাবু, করছ কী? কী ব্যাপার?'

'ওই চোর—'

'আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে শুনি না?

'আপনি বুঝতে পারছেন না? এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন চুরি করেছে!'

কল্‌কে কাশি তেমনই অবিচলিত থাকেন, তাই নাকি হে সমাদ্দার? তাই নাকি?'

'প্রফুল্লবাবু তো সেই রকমই ভাবছেন! সমাদ্দার বলে, 'কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কখন যে তা করলুম!'

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে কল্‌কে কাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল্ল রেগে আগুন হয়ে ওঠে কিন্তু একলা সে কী করবে? অপমানেই জ্বলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন ঠ্যাকে যেন! সমাদ্দার ও কল্‌কে কাশির মধ্যে যেরকম অন্তরঙ্গতা তাতে ওর মনে নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে। ওরা দুজনে মাসতুতো ভাই নয় তো?

'তুমি যদি এখুনি আমার কাগজ না ফিরিয়ে দাও, তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব!' প্রফুল্ল ঘুঁসি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

'আহা, হচ্ছে কী এসব! মারামারি করাটা কি ভদ্রলোকের কাজ?' কল্‌কে কাশি ওকে সামলাতে যান।

'আপনি থামুন মশাই! আপনারা দুজনেই এক গোত্র! আমি বেশ বুঝেছি! গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোন কথা আমি শুনছি না আর!' প্রফুল্ল মরীয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—'আপনি যদি আমার গায়ে হাত দ্যান প্রফুল্লবাবু, তাহলে এক্ষুনি আমি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিসে দেব—আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী?'

'বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব! দেখব তোমার কামরাও!'

'স্বচ্ছন্দে! এক্ষুনি।' সমাদ্দার কল্‌কে-কাশির দিকে ফেরে, 'আপনিও সার্চ করতে চান নাকি? আসুন আমার সঙ্গে, দুজনেই আসুন। কোন আপত্তি নেই আমার!'

'বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি',—কল্‌কে-কাশি একটা সিগারেট ধরান। 'তুমি যদি সত্যিই ও-কাগজ নিয়ে থাকো সমাদ্দার তাহলে এখন তোমাকে সার্চ করে কোনই লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তাই যদি আমি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বেশি বিলম্ব হবে না।'

'আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন?' প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

'উঁহু! কল্‌কে-কাশির সংক্ষিপ্ত জবাব। 'আপাতত না।'

'বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে।'

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, ওর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, জুতোর সুকতলাও বাদ দেয় না; সবগুলো জামার ভেতরের-বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে; ঘরের আঁতিপাতি আনাচ-কানাচ সব জায়গায় ওর তল্লাশী চালায়। অবশেষে মুহ্যমানের মত যখন নিজের কামরায় ফেরে তখন কল্‌কে-কাশি জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়েই তিনি বলেন, 'তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু, এখন ওকে সার্চ করে কোন

ফলই হবে না। কোথায় ও জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তাই না আঁচ করতে পারছি—'

সমাদ্দার ফিরতেই কল্‌কে-কাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোন জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেই সে যেন নেই তখন; এতটাই সে দমে গেছে।

'তবে, সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু। তুমিই বল, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?' কল্‌কে-কাশি তাঁর কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লর এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কল্‌কে-কাশি সমাদ্দারকে বলেন, 'ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে! ওর মুখ দেখলে মায়া হয়!'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমল-হৃদয়, সত্যি সত্যিই দুঃখ হয় ওর। 'বিজনেস ইজ বিজনেস, মিষ্টার কল্‌কে-কাশি!' সে বলে।

'সেকথা হাজার বার! কিন্তু ভেবে দেখ দিকি কী সর্বনাশটা হল ওর, হয়ত চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়েছে, আমিও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।' কল্‌কে-কাশি সমাদ্দারের চোখের ওপর চোখ রাখেন—'কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?'

সমাদ্দার হাসে, আমি যে রেখেছি আমি তো তা স্বীকারই করিনি।'

'না। এবং তোমাকে স্বীকার করতে বলছিও না। তবে একথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে তুমি সটকাতে পারছ না। হাওড়ায় নেমেই আমি তোমাকে আটকাব এবং খানাতল্লাসি করব—যাকে বলে পুলিসের খানাতল্লাসি।'

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। 'সেটা কি সঙ্গত হবে মিঃ কল্‌কে-কাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার তো আপনি বিন্দু-মাত্রও প্রমাণ পাননি।'

'না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই।'

কল্‌কে-কাশির সঙ্কল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় ঠাওরায়। ঘরের দরজায় খিল আঁটে। তারপর নিজের স্যুটকেস বার করে এক কোণের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার ফলে ডালার দিকে লুকানো খুপরি খুলে যায়। তার ভেতর থেকে সদ্য-অপহৃত নমিনেশন পেপারটা বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্‌দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেইসঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা, এখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল আসল কাগজ চেনার সুবিধের জন্যে। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে প্রথম কাগজের দেখাদেখি ব্যানার্জির সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু এই সই : কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ সই যে জাল করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের ওপরে লেখে মিস্টার সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে রেজিস্ট্রী করে পাঠানোই সে সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও কাগজটা তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার কাছেই, সুতরাং তার অসুবিধে হবার কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোষ্ট-অফিসের উদ্দেশে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপন মনেই বলে যেন, 'দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'তাই নাকি?' কল্‌কে-কাশি সিগারেটের সামান্য অবশেষটা ফেলে দিয়ে উঠে বসেন, 'তাহলে তো ওর ঘরটা একবার তল্লাস করতে হয়! এই তো সেরা সুযোগ।'

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। সবিস্ময়

প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি সমাদ্দারের ঘরে ঢোকেন।

'কোথায় কোথায় তুমি খুঁজেছিলে?'

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে।

'এই সুটকেসটা দেখেছিল?'

'হ্যাঁ। ওর ভেতরেও দেখেছি। ওতে নেই।'

'দেখেছ ঠিকই। কিন্তু আরেকবার দেখা যাক।'

কল্‌কে-কাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন, ভেতরের যা কিছু জিনিসপত্র সব তাঁদের পায়ের কাছে উজাড় হয়।

'দেখলেন তো? বললাম ওতে নেই।' প্রফুল্ল বলে।

কল্‌কে-কাশি ওর কথায় কান দেন না; খুঁজতে খুঁজতে সেই গুপ্ত বোতাম আবিষ্কৃত হয়। 'পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষণে পেয়েছি।'

'কী?'

'এই দেখ।' চাবি টিপতেই সেই লুকানো ডালা প্রকাশ পায়। আর, তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্লর হাতে তুলে দেন। 'এই নাও, কিন্তু সাবধান, আর যেন খোয়া না যায়।'

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দুহাতে কল্‌কে-কাশির একখানা হাত চেপে ধরে—'আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাফ করুন—'

উত্তরে কল্‌কে-কাশির শুধু অল্প হাসি দেখা যায়। ব্যাগের যাবতীয় জিনিসপত্তর যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন আবার।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কল্‌কে-কাশির কাছে। 'এটা কি ভাল হল আপনাদের মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে, সুটকেস খুলে—'

কল্‌কে-কাশি বাধা দেন—'আমরাই যে তোমার ঘরে ঢুকেছি, সুটকেস খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চল না সমাদ্দার।'

প্রফুল্ল এতক্ষণে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকে, ভয়ানক রাগের ভান করে; কিন্তু সেও মনে মনে হাসে।

আর মিস্টার কল্‌কে-কাশি? তাঁর মুখে কোনো হাসি দেখা যায় না কিন্তু।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—'একবার বাগাতে পেরেছে, আর পারবে না। এ কোট আর আমি গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও নয়!'

'ঠেকে শেখা ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু!' কল্‌কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'এবং একবারই এই শিক্ষা একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আচ্ছা, মিস্টার কল্‌কে-কাশি, স্যুটকেসটার যে একটা গোপন খুপরি আছে, কি করে আপনি তা বুঝলেন?'

'তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।' কল্‌কে-কাশি ব্যাখ্যা করে দেন—'ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস-টুপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু?'

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসংকোচেই বলে, 'এবার থেকে পড়ব, নিশ্চয় পড়ব।'

আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!' সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো?' কল্‌কে-কাশি জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ, কালই দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার। সমাদ্দার উত্তর দেয়, কেন, কী হয়েছে তাঁর?'

'না, এমন কিছু না।' কল্‌কে-কাশি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান। 'এখন দশটা, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার সব দাখিল করা হবে কিনা! তোমাকে আমি কেটে পড়ার জন্যেই বলতে এলাম। বন্ধুভাবেই বলতে এসেছি বলাই বাহুল্য!'

'কেটে পড়ব। আমি? কেন?' সমাদ্দার সচকিত হয়।

'সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ সেই জন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডা তো নেহাত কম নেই, যাদের তুলনায় তুমি তো আস্ত দেবদূত!'

'ফাঁকি দিয়েছি কিরকম?' সমাদ্দার এবার হাসে, 'আপনি কি তাহলে এখনো বুঝতে পারেননি মিঃ কল্কে-কাশি, আমার স্যুটকেস থেকে যে কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল সই করা?'

'আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।' কল্কে-কাশির গলার স্বর গম্ভীর।

'তবে?'

'আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনো বুঝতে পারোনি, সমাদ্দার! প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে, সেটাও জাল ছাড়া কিছু নয়।'

অ্যাঁ' এবার সত্যিই চমকে ওঠে সমাদ্দার—'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়। যে সময়ে তুমি বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির আপিস থেকে আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন করে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়! যাক এখন সব বুঝতে পারছ তো—যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার দিকে না পড়ে. সেজন্যই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সব কিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলাভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে মতন জামা খুলেছি; আমিই রেখেছি যে, তা তুমি জানতে পারোনি ঘুণাক্ষরেও। প্রফুল্লও তা জানে না; কোনদিন জানবেও না। যাক বেচারা, আনন্দেই আছে, ওর মাইনে বেড়ে গেছে খবর পেলাম—'

—ঃঃ সমাপ্ত ঃঃ—